জুলাই' ৮৪

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি, স্ক্যান ও এডিট - সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়বৃদ্ধির জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সংখ্যার দাম অনোন্যপায় হয়ে আমাদের ২.৫০ থেকে ৩.০০ টাকা করতে হয়েছে আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী পাঠকেরা আমাদের এ অনুরোধ মেনে নেবেন।

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩.০০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

নতুন গ্রাহক করা হচ্ছে

গ্রাহককার্ড রিনিউ করার জন্য ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।

গ্রাহককার্ড রিনিউ করার শেষ তারিখ ১৫ জুন ১৯৮৪।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।
- এজেন্সী রিনিউ করার শেষ তারিখ ১৫ জুন ১৯৮৪।

প্রচারসম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড • কলিকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

চতুর্থ বর্ষ 3য় সংখ্যা
জুলাই 1984

সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আশাকরি তোমরা সব্বাই ভালভাবে পাশ করেছ। এরপর অনেকেই কলেজে ভর্তি হবে—আবার কেউ কেউ হয়তো টেক্‌নিক্যাল পড়াশোনার দিকে ঝুঁকবে। সকলের প্রতিই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুভেচ্ছা রইল।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যারা সফল হয়েছে তাদের নাম এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। সকল প্রতিযোগীদের সম্মানমূল্য ও মান পত্র ডাকযোগে পাঠানো হবে। গল্পরচনা প্রতিযোগিতায় যারা ইচ্ছুক তারা ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে লেখা পাঠাতে পারো।

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1 ॥ চিঠিপত্র 2 ঘনাদা ক্লাব 2

দপ্তর থেকে

একটি পাখির মৃত্যু ॥ সমরজিৎ কর 4

বিশেষ রচনা

ইঞ্জিনীয়ারিং কথা ॥ সিদ্ধার্থ রায় 7

পড়াশোনা

পদার্থের অবস্থা, ধর্ম পরিবর্তন ও শ্রেণীবিভাগ ॥ অমরনাথ রায় 27
আলোক ॥ অলক চক্রবর্তী 36 : পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক ॥ দিনোজ কুমার দে 44 : প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা ॥ সুবীর চক্রবর্তী 16

ছবিতে গল্প

খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18 : বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 20 : লস্ট ওয়াল্ড ॥ স্যার আর্থার কোনান ডোয়েল লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার 45, 46, 47, 48 : খোঁজ খবর ॥ 17

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

অচেনা হাত ॥ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার : ভাষান্তর এণাক্ষী চট্টো: 9
বঙ্কুবাবুর গল্প ॥ বিমলেন্দু মিত্র 29

পশু পাখি উদ্ভিদ

পৃথিবীর প্রথম প্রাণী প্রোটোজোয়া ॥ রমেন মুখোপাধ্যায় 12
উলুক বংশ ॥ অজয় হোম 34 : সর্পগন্ধা ॥ সন্দীপ সেন 25

উপন্যাস

সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 21

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ॥ দিবাকর সেন 37

আবিষ্কারের গল্প

কাগজের জন্মকথা ॥ তপনকুমার সিংহ 32

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

মেরুজ্যোতি ও তার উৎস ॥ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় 27 : জোয়ার ভাটা ॥ নীহার ভট্টাচার্য 13 : মজার সুতো ॥ অতীন অধিকারী 43 : বিচিত্র সংবাদ ॥ মাণিকচাঁদ মারোঠী, বরুণ মজুমদার, প্রণব সেন, চৈতালী ঘোষ 42
কেমন করে কাজ করে : এরোপ্লেন কেন ওড়ে ॥ অনীশ দেব 38
পরীক্ষার জন্য তৈরী হও ॥ হান্নান আহসান 40
বুদ্ধি নিয়ে খেলা ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 41
ছড়া : আলোর চেয়েও জোরে ॥ রবীন সুর 33

ছোটদের দপ্তর

নলেজ ক্যুইজের উত্তরদাতাদের নাম 49, 50 : ব্লিচিং পাউডার থেকে বিদ্যুৎ ॥ মতিউর রহমান 51 : ভেবে ভেবে বল ॥ শুভাশিস ঘোষ 52 : শব্দকূট ॥ কিংশুক সেন 52 : জানা-অজানা ॥ সৌমিত্র মজুমদার 53 : ভারী জল ॥ অশোক বড়াই 53 : নলেজ ক্যুইজ ॥ 54 গত সংখ্যার উত্তর 52 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 55 : পেনিসিলিন ॥ চন্দ্রমৌলি মুখোপাধ্যায় 56

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল

দু'টি করে মডেল চাই

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আমার প্রিয় পত্রিকা। সেই কারণে এই সময়েতে কিছু মতামত না রেখে থাকতে পারছি না।

প্রস্তাবিত মতামতগুলি হলো ঃ

1. পেন প্যাল্ বা পত্রমিতালী বিভাগ শীঘ্রই প্রকাশ করা হোক। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

2. পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু বাড়ালে ভাল হয়।

3. 'নিজে করো' বিভাগের মডেলগুলি একটু উন্নত ধরণের হলে এবং প্রতি সংখ্যায় দুটি করে মডেল দিলে ভাল হয়।

4. 'পরীক্ষার জন্য তৈরী হও' ফিচারটির প্রস্তাবনার জন্য মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এবিষয়ে একটা বিশেষ অনুরোধ, যেন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সুফল লাভ করতে পারে।

দীপকসূত্রধর। রাজপুরনন্তী, বর্ধমান

নতুন বছরের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান হাতে পেয়ে যার-পর-নাই আনন্দ হল। এই পত্রিকা সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি।

1. প্রচ্ছদে যদি অপ্রয়োজনীয় ছবি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ছবি (বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর) দেওয়া হয় তাহলে প্রচ্ছদের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

2. সামগ্রিকভাবে 'করে-দেখ' বিভাগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গত কয়েকটি সংখ্যায় দেখছি 'ইলেকট্রনিকস' জাতীয় যে সমস্ত জিনিস তৈরীর প্রণালী দেওয়া হয়েছে, তা তৈরী করা অধিকাংশ 'কিশোর-কিশোরীর' পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আপনারা যদি 'করে দেখ' বিভাগে 2টি মডেল (1টি ইলেকট্রনিকস 1টি সাধারণ) দিয়ে প্রত্যেকটি প্রস্তুতের আনুমানিক খরচ দিয়ে দেন তাহলে ভাল হয়।

3. আপনারা যদি বিজ্ঞানের কিছু জটিল প্রশ্ন রেখে তার ওপর কিছু পুরস্কার (সামান্য হলেও) ঘোষণা করেন তাহলে ভাল হয়।

4. 'খোঁজ খবর' বিভাগটি যদি নিয়মিত হয় তাহলে ছবিটি ফটো আকারে (অর্থাৎ একপিঠ সাদা) রাখলে ভাল হয়।

শুভজিত মিত্রমজুমদার

ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত

আমার মতে বেশ কিছু ছেলের ইলেকট্রনিকস-এর বিভিন্ন জিনিস বানাবার নেশা আছে। কিন্তু ইলেকট্রনিকস-এর সার্কিটের ছবিসহ বিশ্লেষণ কেবল ইংরেজী বইয়ে থাকে। বাংলা বই দেখা যায় না। তাই আমার অনুরোধে নতুন বছরের গোড়া থেকে এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করুন।

সুপ্রভাত ও দেবু, কল্যাণী, নদীয়া

সিমেণ্ট উৎপাদন

এপ্রিল '84 সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'গৃহনির্মাণের উপাদান সিমেণ্ট' প্রবন্ধে লেখক ভারতের যে মানচিত্র দিয়ে উৎপাদনের স্থানসমূহ উল্লেখ করেছেন—সেখানে আসামের বোকাজান এবং মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির নিকটে 'মামলু' সিমেণ্ট কারখানার কোন উল্লেখ নেই। মানচিত্রে এই দুটি স্থানের নাম উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

সরোজ দাস, করিমগঞ্জ, আসাম

সায়েন্স ক্লাব

পত্রিকায় নতুন নতুন বিভাগ খুলেছেন দেখে আনন্দিত হলাম। প্রসঙ্গতঃ আরেকটি নতুন বিভাগ খোলার আবেদন জানাচ্ছি। আশাকরি এ সম্পর্কে ভেবে দেখবেন।

কলকাতার বাইরে মফঃস্বলের শহর বা গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছে কিছু সায়েন্স ক্লাব। অথচ সেগুলো নানা-বিধ সমস্যায় ধুঁকছে। নতুন বিভাগ খোলার আর্জি সে সমস্ত Science Club গুলোর কথা ভেবেই। এ বিভাগে আপনারা সেই সমস্ত সমস্যা-গুলোর কথা জনসমক্ষে তুলে ধরুন। বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞানচর্চা কেমন চলছে (বিধিসম্মত পড়াশুনা বিষয়ক বিজ্ঞান চর্চা বাদে) তাও বিভাগটিতে আলোচনা করুন। আশা করি তাতে পাঠকরাও যেমন আনন্দিত হবেন তেমনি অন্যান্যরাও উপকৃত হবেন।

দেবব্রত রায়, সিঙ্গাতলা, মালদা

আর্যভট্ট বিজ্ঞান ক্লাব

আপনারা একটা বিজ্ঞান ক্লাব খুলুন যার নাম হোক প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্যভট্টের নাম অনুসারে 'আর্যভট্ট বিজ্ঞান ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রধান কার্যালয় হবে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকা। এই ক্লাবের সভ্যরা আপন আপন এলাকায় এর শাখা খুলবে। এবং অজ্ঞ মানুষদের কাছে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব পালন করবে। আশা করি আমার প্রস্তাব ভেবে দেখবেন।

অচ্যুত সিংহ, অমরকানন, বাঁকুড়া

নিয়মিত বিভাগের সঙ্গে নতুন বিভাগ কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানের মর্যাদা ও আকর্ষণ বাড়িয়েছে

শুধু বিজ্ঞান নিয়ে সারাদিন সারারাত মেতে থাকলে চলবে না। এরই ফাঁকে খেলাধুলোয় অবকাশ দিতে হয়। তাজা শরীর গঠনের পক্ষে অপরিহার্য, অর্থাৎ অতীব প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উঁকি মারছে বিজ্ঞান প্রসারের দিকে। যেহেতু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে হয় এমনতরো যাবতীয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের মতামত ও আনুসঙ্গিক ব্যাপারে যদি উক্ত বিভাগে ব্যাপৃত থাকে, তবে আশাকরি কিশোর-কিশোরীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। যেহেতু কিছুনা কিছু খেলাধুলো সকলেই ভালোবাসে। সর্বোপরি এই পত্রিকা এক মহান আদর্শের নেতৃত্ব বহন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা ও মর্যাদা বাড়বে। **সুব্রতকুমার সাহু**, দশগ্রাম, মেদিনীপুর।

'নিজে কর' দুটো কিংবা একটা থাকলেও ক্ষতি নেই কিন্তু এটা বেশ ভাল করে খুলে (ব্যাখ্যা করা আর কি) বলা হয় না তাই আমার মনে হয় অনেকে চেষ্টা করেও নিজে করতে পারে না। এর সঙ্গে বেশীর ভাগই একটা করে আবিষ্কারের গল্প থাকে আমার মনে হয় দুটো, তিনটে করে দিলে আরও জনপ্রিয়তা লাভ করে। **মনোরঞ্জন মণ্ডল**, নবদ্বীপ, নদীয়া।

আমি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। প্রিয় পত্রিকা পড়ে আমি আমার 'বিজ্ঞান' বিষয়ক বহু সংবাদ পিপাসা মেটাতে সক্ষম হই। আমি প্রিয় পত্রিকার একজন পাঠক হিসেবে কয়েকটি ফরমাস দিচ্ছি। আশা রাখি আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ভেবে দেখবেন। ১। খেলাধুলো বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা প্রয়োজন। ২। প্রশ্নোত্তর বিভাগ নিয়মিত দুই পৃষ্ঠা রাখার আবেদন করছি। ৩। বর্তমান পৃথিবীর নানান জায়গার বিজ্ঞান বিষয়ক নানা খবর পত্রিকার মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করলে ভালো হয়।

এ বি. এম **রবিউল হক চৌধুরী**, চৈতা, বসিরহাট

আপনারা 'অঙ্ক ভাবনা', 'বিচিত্র জীবজন্তু', 'খোঁজখবর', 'কেমন করে কাজ করে', 'বুদ্ধি নিয়ে খেলা' ইত্যাদি শিরোনামে নতুন নতুন বিভাগ খুলেছেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। এরা ছাড়া আরো কিছু নতুন বিভাগ খুললে আমার মনে হয় আমার প্রিয়,কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। আমার মতে 'রোগ ও তার নিরাময়', 'অঙ্কের ম্যাজিক', 'বিজ্ঞানের বিস্ময়', 'কবে কি ঘটবে' ইত্যাদি শিরোনামে নতুন নতুন বিভাগ চালু করুন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, মামুদপুর, ২৪ পরগণা

আমার মতে পড়াশুনা বিভাগটি যেন নিয়মিত চলতে থাকে অর্থাৎ যে সংখ্যায় যে ভাবে সাজিয়েছেন, অঙ্ক নিয়ে একটা, রসায়ন নিয়ে, পদার্থবিদ্যা নিয়ে একটা এবং জীবন বিজ্ঞান নিয়ে একটা এই ভাবে যে চারটি বিভাগ ছিল সেই বিভাগগুলি যেন সেইভাবে মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরপর প্রতিটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। আর এগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকলে আরো ভালো হত। এবং সেটাই চাইছি। আশা করি এটি পেলে সকল পাঠক-পাঠিকা বৃন্দ খুশী এবং উপকৃত হব। আশা করি এই বিনীত অনুরোধ আপনারা রাখবেন। **মনোমোহন টুডু**, দুর্গাপুর, বর্ধমান

ঘনাদা ক্লাব

নিয়মাবলী ঃ—তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে সাধারণ সদস্য, সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বিশেষ সদস্য এবং দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলে, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন।

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি? ২। নকল ইবন করিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল? ৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল? ৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল? ৫। দ্বিতীয় বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে? ৬। 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস? ৭। ই. ইউ. ডব্লিউ সি. এবং এম্. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি? ৮। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই—এমন কোন ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন? ৯। 'পর্দাচিরস মার্মোরেটাস' কিসের নাম? ১০। 'কয়া' কে?

সঠিক উত্তর দিয়ে সাধারণ সদস্য হয়েছেন—তারক অধিকারী, দয়াশাড়ি পাওয়ার হাউস রাণাঘাট, নদীয়া। সাহা আলাম শেখ, পোঃ বারুইপুর ২৪ পরগণা। শমিত ব্যানার্জী বাগবাজার বড়ালবাগান, পোঃ চন্দননগর হুগলী। মলয় কুমার সামন্ত, আকটার কেয়ার কলোনী, পোঃ ডিগ্রী, জেলা মেদিনীপুর ৭২১২৫২ ইসরাত আরা খাতুন ও সাবনাম আরা খাতুন পোঃ বারুইপুর, ২৪ পরগণা। পি. দাস পোঃ মগরা, হুগলী ৭১২১৪৮, দীপক দে, পাওয়ার হাউস পাড়া বেলতলা পার্ক, পশ্চিম-দিনাজপুর, সৌমেন মজুমদার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি সমিত ও স্বপ্রত দেওঘরিটা, দুর্গাপুর ১০ বর্ধমান।

একটি পাখির মৃত্যু

সমরজিৎ কর

ঠিক মৃত্যু বললে ভুল হবে। বরং বলি অবলুপ্ত।

কতকটা উটপাখীর মত দেখতে। অথবা বলতে পার অতিকায় এক টার্কি। নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ওদের ছিল বাস। কেউ বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ার দরুণই পৃথিবীর বুক থেকে ওদের অস্তিত্ব মুছে যায়। আবার অনেকের ধারণা, ওদের সাবাড় করার মূলে মানুষ। প্রায় হাজার বছর আগে ভাগ্য ফেরাতে পলিনেশিয়া থেকে নিউজিল্যাণ্ডে পাড়ি জমিয়েছিল একদল মানুষ। ওদের সম্প্রদায়ের নাম 'মায়োরি'। বনের কাঠ এবং পশু-পাখিদের উপরই নির্ভর করত ওদের জীবন। ওদের অত্যাচারেই পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যায় সেই পাখি। নাম 'মোয়াড'। যে পাখি নিয়ে এক সময় কি বিতর্কই না ঘটে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি, কেমন?

দিনটির কথা মনে নেই। তবে ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই হবে। এবং সাল 1844।

লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে নিউজিল্যাণ্ড থেকে সুপ্রাচীন এক ধরণের পাখির কিছু হাড় নিয়ে আসা হয়েছে। সেই হাড়ের উপরই বক্তৃতা।

রীতিমত তুলকালাম কাণ্ড! শহরে ডাকসাইটে পণ্ডিতরা তো বটেই, সেই সঙ্গে এসেছেন যত সব গণ্যমান্য। যাকে বলে বাছাই মানুষের ভীড়। যাকে বলে উৎসব। এই উৎসবে চা পরিবেশনের দায়িত্ব কার উপর ছিল, জানো? সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী খোদ মাইকেল ফ্যারাডে স্বয়ং। কেনই বা তা হবে না? বক্তাটিও তো বড় কম লোক নন? একেবারে অধ্যাপক রিচার্ড ওয়েন। ইংলণ্ডের এক নম্বর অ্যানাটমিস্ট বা শারীরস্থানবিজ্ঞানী এবং পুরাতত্ত্ববিদ্।

এই বক্তৃতার ছোট্ট একটি ইতিহাসও ছিল। 1839 সালে নিউজিল্যাণ্ড থেকে সদ্যফেরা একদল নাবিক অধ্যাপক ওয়েনকে কিছু হাড়গোড় উপহার দেয়। হাড়গুলি তারা নিউজিল্যাণ্ডেই সংগ্রহ করেছিল। ওয়েন সেই হাড়গুলি পরীক্ষা করে জানালেন, এ সব হাড় অতিকায় কোন পাখির যাদের দেখতে উটপাখির মত। তবে সেই পাখির সন্ধান তখনো পর্যন্ত অজ্ঞাতই ছিল। ওয়েন পাখিটির উপর একটি প্রবন্ধও লিখে ফেললেন।

কিন্তু প্রবন্ধটি ছাপাতে গিয়ে তিনি পড়লেন ফ্যাসাদে। প্রবন্ধটি তিনি দিয়েছিলেন লণ্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটিকে। সোসাইটির বিশেষজ্ঞরা বললেন, এ প্রবন্ধ ছাপা চলে না। ওয়েন বলছেন, এ পাখি অবলুপ্ত। তাহলে তো তার হাড়গোড় জীবাশ্ম হিসেবে পাওয়ার কথা। কারণ অবলুপ্তি যদি সত্যিই তারা হয়ে থাকে নিশ্চয় তারা তা হয়েছিল হাজার বা লক্ষ বছর আগে। আর একমাত্র সে ক্ষেত্রেও পাওয়া যেতে পারে জীবাশ্ম। কিন্তু ওয়েন যে হাড়গুলি দেখাচ্ছেন, তা দেখে মনে হয় খুঁজলে এখনো তাদের দেখা যেতে পারে। যাই হোক, ওয়েনের খ্যাতির কথা ভেবে প্রবন্ধটি শেষ পর্যন্ত ওঁরা না ছেপে অবশ্য পারলেন না।

এই ঘটনার বছর চার পর নিউজিল্যাণ্ডের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরো হাড়গোড়। এবার ওয়েন কিন্তু ধারণাটি প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন। এর পর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ওয়েন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী বিচিত্র এই পাখি নিয়ে কত রকম কথাই না বললেন। পলিনেশিয়ানরা পাখিটির নাম রেখেছিল 'মায়োস'। এটি তাদেরই ভাষা। যার অর্থ 'মোরগ'। প্রশ্ন দাঁড়াল, কি ভাবে এই পাখি এল নিউজিল্যাণ্ডে? কি ভাবে ঘটল বিবর্তন, যার ফলে দেখা দিল তাদের নানা রকম জাত? তাদের অবলুপ্তিরই বা কারণ কি?

'মায়োস', 'র‍্যাটাইটস' গোষ্ঠীর পাখি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার 'রেয়াস', আফ্রিকার 'অসট্রিচ' বা উটপাখি, মাদাগাস্কারের অবলুপ্ত হস্তীপাখি, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনির কসোওয়ারিস পাখি এবং নিউজিল্যাণ্ডের 'কীউই' পাখি। একমাত্র 'কীউই' ছাড়া অন্যান্য পাখি আয়তনে বিশাল, একই রকম প্রায় চেহারা এবং কেউই উড়তে পারে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা একসময় উড়তে পারত এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমাত। 'রেয়াস' এবং 'অসট্রিচ' কাছাকাছি বংশের পাখি। তাদের

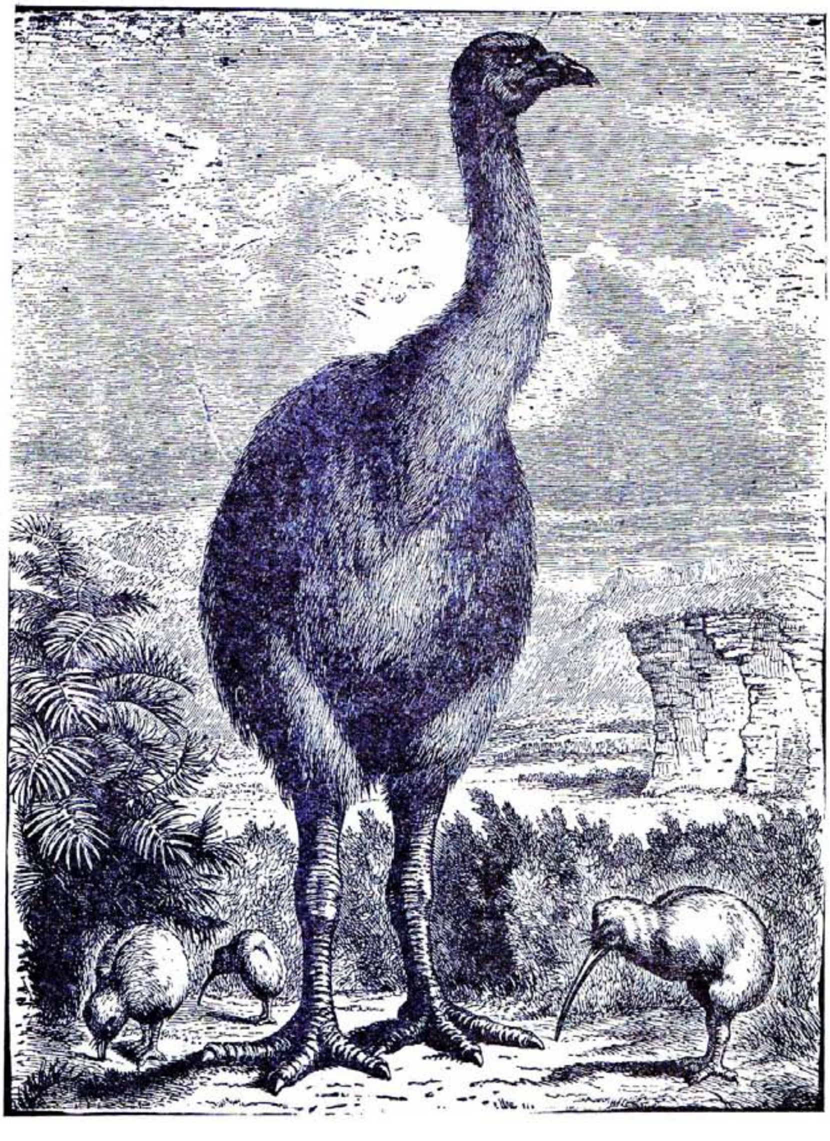

পলিনেশিয়ানরা পাখিটির নাম রেখেছিল 'মায়োস'। এটি তাদেরই ভাষা। যার অর্থ 'মোরগ'। কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য বলছেন, পুরোপুরি অবলুপ্ত এখনো তারা হয়নি। গভীর জঙ্গলে গেলে তাদের দু'একটি হয়তো চোখেও পড়তে পারে। তবে খবর এই, এখনো পর্যন্ত কারোর চোখে পড়েনি।

হাড়গোড়ের উপর নির্ভর করে 'মোয়া'র এই ছবিটি এঁকেছেন জনৈক শিল্পী

সঙ্গে 'এমু' এবং কসোয়ারিমেরও সম্পর্ক ছিল। এদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হস্তীপাখির। আর এদের সবগুলির সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল 'কীউই' এবং 'মোয়াসের'। অনুমান, র‍্যাটাইটদের পূর্বপুরুষরা এক সময় বাস করত দক্ষিণ গোলার্ধের অতিকায় এবং অখণ্ড এক ভূভাগে। আট থেকে তেরো কোটি বছর আগে 'ক্রিটেসাস' বা খড়ি-মাটি যুগের (ভূতাত্ত্বিক যুগ) মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে সেই ভূখণ্ডটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়। সৃষ্টি হয় ছোট ছোট ভূখণ্ড। সেইসব ভূখণ্ড ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তখন ওই সব প্রজাতিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সময় ওই মহাদেশীয় ভূখণ্ডের একটি, যার নাম নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিম কুমেরু মহাদেশের রস আইস শেলফ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। মজার ব্যাপার এই, ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করে জানা গেছে, শুধু নিউজিল্যাণ্ডই নয়, পশ্চিম কুমেরু ভূখণ্ড মাঝে মাঝে কখনো সংযুক্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিজ্ঞানী-দের ধারণা, গোড়ার দিকে র‍্যাটাইট পাখিদের পূর্বপুরুষরা ছড়িয়ে ছিল নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিম কুমেরুর ভূখণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে। পরে ওই সব ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল নিউজিল্যান্ড। সেও প্রায় আট কোটি বছর আগের ঘটনা। তখন র‍্যাটাইটদের পূর্বপুরুষদের এক দল অন্যান্য অঞ্চলের র‍্যাটাইটদের থেকে চিরকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ড ভূখণ্ডেই তখন তাদের মধ্যে চলল জৈবিক বিবর্তন। সৃষ্টি হল কম করেও তাদের ছয়টি 'গণ' এবং প্রায় তের থেকে পনেরটি প্রজাতি। এক একটি প্রজাতির দেহের আয়তন হল এক এক রকম। মাথা এবং ঠোঁটের আকৃতিও হল ভিন্ন ধরনের। এই পাখিরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয় মোয়া এবং কীউই। অর্থাৎ একদল পড়ল 'মায়ো' গোষ্ঠীর মধ্যে. অপরদল পড়ল 'কীউই' গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রথম দল হল আকারে বড়। উচ্চতায় কেউ কেউ বা নয় দশ ফুট। আর কীউই প্রজাতিরা হল তুলনামূলক ভাবে অনেক ছোটখাটো। সম্ভবত খাদ্যাভ্যাসের তারতম্যের দরুনই এমনটি হয়েছিল। আরো একটি মজার ব্যাপার। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মোয়া পাখিদের প্রচুর হাড়গোড়। যাদের বয়েস 600 থেকে 33000 বছর। আর যে সব জায়গা থেকে তাদের পাওয়া গেছে সেখানে ছিল মানুষের বসতি। পলিনেশিয়া থেকে যারা সেখানে পাড়ি দিয়েছিল তারাই সেখানে এসে বেশ জেঁকে বসেছিল।

ইতিমধ্যে বিবর্তনের পথ ধরে মোয়াদের মধ্যে এসেছে অনেক পরিবর্তন। কে একে গড়ে উঠল নানান প্রজাতি। তাদের গঠনবৈচিত্র্যের মধ্যে দেখা দিল ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন ধরো 'ডাইনরনিস'। এরা হলো আবার চার রকমের। কারোর উচ্চতা পাঁচ থেকে ছয় ফুট, কারোর বা নয় থেকে দশফুট, গড়ে উঠল ইউরাইপেট্রিক্স এবং প্যাণ্ডাইওরনিস নামে দুদুটি প্রজাতি। এরা উচ্চতায় পাঁচ থেকে সাত ফুট। অবশিষ্ট প্রজাতিরা হল মোলেপটেরিস, অ্যানোমাল-পটেরিক্স এবং এমু। এরা উচ্চতায় চার থেকে পাঁচ ফুট। এদের চোয়াল এবং চঞ্চু অন্যান্যদের তুলনায় ছোট এবং দুর্বল।

এদের এমন দৈহিক ভিন্নতার কারণ কি?

এ সম্পর্কে নানা রকম মতবাদের কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের সেই সব মতবাদের সার কথা হল: মায়োরা ভৌগোলিক দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক একটি দল অপর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক একটি অঞ্চলের আবহাওয়া ছিল এক এক রকম। কোথাও উষ্ণতা, কোথাও অতিরিক্ত শীত। আবার একই অঞ্চলে তাদের খাবার দাবারের উপরও চাপ পড়ে বেশি। নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক প্রজাতি বেছে নিল এক এক রকম খাবার। ফলে এক প্রজাতির খাবারে অন্যেরা তেমন হাত দিল না। কারোর খাবারে অভাবও পড়ল না এই কারণে। আবহাওয়া এবং বিশেষ বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাসের দরুণ তাদের শরীরিক গঠনে দেখা দিল ভিন্নতা।

কিন্তু কাল হলো পলিনেশিয়া থেকে ওই মায়োরি গোষ্ঠীর মানুষরা। পলিনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে তারা এসে বাস করতে লাগল নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণের দ্বীপগুলিতে। গোড়ায় তাদের সংখ্যা ছিল কম। পরে তা এসে দাঁড়ায় এক লক্ষের মত। ওই অঞ্চলে বাস করতে এসে পাহাড় এবং উপত্যকার প্রচুর গাছপালা ওরা জ্বালিয়ে ফেলল। খাদ্যের জন্যে নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল মোয়াদের। তাদের হাড়গোড় দিয়ে তৈরী করল নানা রকম সাজসরঞ্জাম। বন কেটে এবং জ্বালিয়ে মিষ্টি আলু এবং অন্যান্য ফসল চাষের দরুন, মোয়াদের বাসস্থাও হল নির্মূল। এই অবস্থায় পড়ে মোয়াদের সংখ্যা দিন দিন কমে এল। এখন অবলুপ্ত।

কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, পুরোপুরি অবলুপ্ত এখনো তারা হয় নি। গভীর জঙ্গলে গেলে তাদের দুএকটি হয়ত চোখেও পড়তে পারে। তবে খবর এই, এখনো পর্যন্ত কারোর চোখে পড়ে নি।

এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, জীবজগতের অব-লুপ্তির পেছনে মানুষের ভূমিকাও বড় কম নয়, তাই না?

ইঞ্জিনিয়ারিং কথা

সিদ্ধার্থ রায়

ইঞ্জিনীয়ারিং অথবা প্রযুক্তিবিদ্যা কথাটা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, হয়ত বা তোমাদের কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছও, কিন্তু কথাটার অর্থ অথবা এর বিভিন্ন বিভাগগুলো জানা আছে কি ? এসব নিয়েই আজকের আলোচনা।

ইঞ্জিনীয়ারিং কথাটার একটা সহজ সংজ্ঞা দেওয়া কিন্তু মোটেই সহজ নয়। গত দেড়শ বছর ধরে অনেকে এর অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু তার বেশীরভাগই তাৎপর্য-হীন হয়ে পড়েছে কারণ সময়ের সাথে বিষয়টার রূপ সমানে বদলেছে। 1828 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ স্থপতি টমাস ট্রেটগোল্ডই বোধ হয় সর্বপ্রথম একটা বাক্যের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেন : 'মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এবং স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রকৃতিতে বর্তমান অসীম শক্তিকে দরকার মত ব্যবহার করার কৌশল।' এর পরে বহুলোকে নানাভাবে ইঞ্জিনীয়ারিংকে সংজ্ঞায় বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'ইঞ্জিনীয়ারিং কাউন্সিল ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট' একটা সুন্দর ও ছোট সংজ্ঞা দিয়েছেন যা নিয়েই আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করব : 'ইঞ্জিনীয়ারিং এমন একটা বৃত্তি যেখানে অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে গাণিতিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শক্তিসমূহকে সুলভে কাজে লাগানর পথ বের করবার জন্য বিবেচনার সাথে প্রয়োগ করা হয় যাতে মানবজাতির কল্যাণ হয়।'

উপরের সংজ্ঞায় বিষয়টির তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। প্রথমটি সমাজের কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিক এবং তৃতীয়টি স্বল্প ব্যয়ে সময়, শ্রম, অর্থ কাজ করার ক্ষমতা।

বিজ্ঞানচর্চা নিঃসন্দেহে মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিন্তু অনেক সময় বিজ্ঞান গবেষণার বিষয় অথবা ফল মানুষের আশু কি উপকারে লাগবে তা বোঝা যায় না। প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণা অথবা অনুশীলন কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই করা হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বুঝতে পারলে প্রযুক্তিবিদ্যার অর্থও অনেকটা পরিষ্কার হয়। বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে, প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে সেই জ্ঞানকেই সমাজের কাজে লাগান হয়। ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের যে কোন বিষয়ের যে কোন সমস্যা বা প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে তার মূলে রয়েছে এক বা একাধিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সচলতা অর্থাৎ ক্রমোন্নতি নির্দেশ করে। কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রয়োগ আরো সুলভে এবং সুন্দরভাবে করবার চেষ্টায় সেই প্রযুক্তির রূপ সমানে বদলায়। গত শতাব্দীর প্রযুক্তিবিদ্যা আজকের শতাব্দীতে ইতিহাস, গত দশকের প্রযুক্তিবিদ্যাও হয়ত আজকের দশকে পুরাতন হবার মুখে।

ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনার প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। সেটি হল চিকিৎসা বিজ্ঞান। এটিও একটি প্রাযুক্তিক বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন জীববিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তিবিদ্যাও তেমনই প্রাকৃতিক ও ভূবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

এত গেল প্রযুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের কথা, কিন্তু এর পরিধি কতটা বা এর সমস্যাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়টির যে কটি বিভাগ বহুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে প্রচলিত সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতির সাথে সাথে রীতিগত বিভাগগুলোর বিষয় এবং তাৎপর্য দ্রুত বদলাচ্ছে। একটা প্রচলিত বিভাগের মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে নূতনতর বিভাগ অথবা কয়েকটি বিভাগের অংশবিশেষের মিলনে তৈরী হচ্ছে যুক্ত (interdisciplinary) পাঠক্রম।

পূর্ত প্রযুক্তিবিদ্যা (Civil Engineering)

ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠক্রমের এটিই সবচেয়ে প্রাচীন বিভাগ এবং ঐতিহাসিক ভাবেও বোধহয় মানুষের বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রাচীনতম সচেতন প্রয়োগ। ঘর-বাড়ি, ইমারৎ, প্রাসাদ, রাস্তাঘাট, নদীর বাঁধ, স্থল-পরিবহন, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় প্রকল্পের নকশা এবং নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিভাগটির বিষয়বস্তু। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সমাজবদ্ধভাবে বেঁচে থাকবার তাগিদেই মানুষ এই প্রযুক্তিবিদ্যা শিখে এর অনুশীলন করেছে।

এই বিভাগ থেকেই অধুনা স্থাপত্য (Architecture) নামের বিভাগটি গড়ে উঠেছে। ঘর-বাড়ী বা যে কোন

পূর্ত নির্মাণকার্য দেখতে কেমন হবে, রূপবৈচিত্র, গঠনশৈলী ইত্যাদি এই বিশেষ বিভাগটির বিষয়বস্তু।

যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যা (Mechanical Engineering)

এককথায় বলতে গেলে এটি যন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রযুক্তিবিদ্যা। যন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটা মনুষ্যসৃষ্ট জিনিস যা বিভিন্ন ধরণের শক্তিকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ যা দিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারি। পেরেক ঠোকবার হাতুড়ি বা কুয়ার জল তোলার কপিকল থেকে শুরু করে সেলাইয়ের কল, রেফ্রিজারেটর, পাম্প, গাড়ীর ইঞ্জিন, ধাতুকর্তনের লেদ, ড্রিল মেশিন ইত্যাদি সবই যন্ত্রের উদাহরণ। বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যপ্রণালী, নকশা, (design), কাঁচামাল, নির্মাণ কৌশল, চালনা রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিভাগটির অন্তর্গত। বলবিদ্যা এবং তাপগতিবিদ্যার তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করেই বিভাগটি গড়ে উঠেছে।

নীচে উল্লিখিত বিভাগগুলো একসময় যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার অংশ ছিল, আজ নূতন বিভাগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিমান (Aeronautical) প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু বিমানের নকশা, নির্মাণ এবং উড্ডয়ন কৌশল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার সেই বিষয়গুলোই পঠিত হয় যা বিমান ও মহাকাশ যান এবং প্রাসঙ্গিক সিস্টেমের জন্য দরকারী।

শিল্প ব্যবস্থা এবং কলকারখানার নকশা এবং সুষ্ঠ পরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগ হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল (Industrial) ইঞ্জিনীয়ারিং। শিল্পের মালপত্র, সঠিক মানের এবং সংখ্যক যন্ত্রপাতি, কর্মী ও পরিচালকের প্রয়োগ এবং কর্মী ও যন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভাগটির আলোচ্য বিষয়।

বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল এবং সুলভে বহুল পরিমাণে উৎপাদনের উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যার (Production Engineering) বিষয়।

বহু মেকানিজম এবং যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে মোটরগাড়ী যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার একটি সুন্দর নিদর্শন এবং পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মোটরগাড়ী সংক্রান্ত যাবতীয় প্রযুক্তিকৌশলের নাম অটোমোবাইল (Automobile) ইঞ্জিনীয়ারিং। জাহাজ নিয়েও একইভাবে নৌ প্রযুক্তিবিদ্যা (Naval Engineering/Architecture) বিভাগ গড়ে উঠেছে।

ফলিত বলবিদ্যা (Applied Mechanics) যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম মূল বিষয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টিকে আলাদা বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

কৃষি সভ্য মানুষের প্রাচীনতম বৃত্তি যা মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার পথ সুগম করেছে। কিন্তু কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা (Agricultural Engineering) বিভাগটি গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিককালে যখন কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। এই বিভাগটিও যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার খুবই ঘনিষ্ঠ।

উপরে বর্ণিত যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার উপবিভাগগুলো কিন্তু স্নাতকোত্তর পাঠ এবং গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে সুচিহ্নিত।

রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যা (Chemical Engineering)

ঔষধ, প্লাস্টিক, অ্যাসিড, সার থেকে শুরু করে কৃত্রিম তন্তু (নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি), সাবান প্রভৃতি অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী হয় রাসায়নিক শিল্পে। রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সুলভে রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করার প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই বিভাগটির বিষয়।

ধাতু প্রযুক্তিবিদ্যা (Metallurgical Engineering)

খনিজ পদার্থ থেকে তামা এবং পরে লোহা তৈরী করার কৌশল মানুষ প্রাচীন কালেই শিখেছিল। ধাতু উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির তাগিদে নূতন এবং উন্নততর ধর্মযুক্ত ধাতু শঙ্কর তৈরী করা এবং তাদের ব্যবহারযোগ্য আকৃতিতে উৎপাদনের কৌশল এবং ব্যবস্থা এ সমস্তই বিভাগটির জ্ঞাতব্য বিষয়।

খনিবিদ্যা (Mining Engineering)

ভূত্বক এমনকি সমুদ্রতলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের (খনিজ তৈল, কয়লা, মাণিক, প্রস্তর ইত্যাদি) অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং শোধন করার প্রযুক্তি। বলাবাহুল্য ভূবিদ্যার (earth science) সাথে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত।

বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যা (Electrical Engineering)

পদার্থবিদ্যার তড়িৎ এবং চুম্বক এবং বিভিন্ন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এই বিভাগটি গড়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন এবং বণ্টন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (instruments), বৈদ্যুতিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (control system), যোগাযোগ (communication) ব্যবস্থা ইত্যাদি এর প্রধান বিষয়।

ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যায় 'ভাল্ভ' নামক একটি বিশেষ ছোট যন্ত্র থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স আজ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল্ভ তথা বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ প্রকৃতি বিষয়টির মূল তত্ত্ব। রেডিও থেকে শুরু করে, ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, কম্পুটার এবং অন্যান্য নানা ধরণের সূক্ষ্ম উন্নত যন্ত্রপাতি এই বিভাগের ফসল।

—তিল্লু! কতবার তোমাকে বলা হয়েছে ওদিকে না যেতে?

—কিন্তু বাবা কেন রোজ যায়?

—ওটাই বাবার কাজ, তিল্লু।

ওদিকের অর্থ একটি সুড়ঙ্গপথ। রোজ তিল্লুর বাবা ঐ পথে কাজে যান আর ঐ দিক দিয়েই ফেরেন। ঐ নিষিদ্ধ পথের ওধারে কি আছে? শুধু তিল্লু কেন ঐ অঞ্চলের বহু লোকের মনে ঐ এক প্রশ্ন। খুব অল্প বাছা কয়েকজন ব্যক্তিকে ঐ পথ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তিল্লুর বাবা তাদের একজন। যখনই তিল্লু বাবার পিছন পিছন ওদিকে যাবার চেষ্টা করে তখনই তার মা বারণ করেন এবং তাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হয়।

আজ অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হল। বাড়ীতে বাবা ঘুমিয়ে, এই সুযোগে তিল্লু তার সিকিউরিটি কার্ডটা হাতিয়ে, মায়ের চোখ এড়িয়ে নিষিদ্ধ পথের দিকে হাঁটা দিল।

সামনে ধাতব দরজা পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। তিল্লু দেখেছে ওর একটা খাঁজের মধ্যে বাবা কার্ডটা ঢুকিয়ে দেন। সেও তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। আলোকিত পথ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কার্ডটা ততক্ষণে আর একটা ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেটা তুলে নিল তিল্লু তারপর একটু উপরের দিকে চড়াই পথ দিয়ে এগিয়ে চলল। মাটির নিচের বসতি থেকে পথটা উঠে এসেছে গ্রহের মাটিতে। যদি তখন দিন থাকে তাহলে সূর্য দেখতে পাবে আর রাত হলে তারা—এই ভেবে তিল্লু উৎসাহিত। সূর্য-তারার কথা সে কত শুনেছে, পড়েছে।

কিন্তু হায়, তিল্লুর কপালে তা ছিল না।

সতর্কতা ব্যবস্থা সম্পর্কে বেচারার কোন ধারণা ছিল না। ইতিমধ্যেই অদৃশ্য যন্ত্রের মাধ্যমে তার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তার ফটোও চলে গেছে সেন্ট্রাল ব্যুরোতে। সেখানে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়েছে সেই ছবি। দশ পা যেতে না যেতেই একটা ভারী হাত তিল্লুর কাঁধ স্পর্শ করল, আস্তে অথচ বেশ শক্ত হাতে তাকে প্রহরীরা বাড়ী পৌঁছে দিল। তার মা ততক্ষণে চিন্তিত এবং বেশ রেগেও গেছেন।

খুব বকুনি খাচ্ছে তিল্লু, এমন সময় আশ্চর্যের বিষয় তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন তার বাবা।

মাকে থামিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, আমি ওকে বুঝিয়ে বলি বরং। ভাল করে জানা থাকলে ও কখনও এমন কাজ করবে না। এই বলে তিনি বোঝাতে শুরু করলেন।

শোন তিল্লু। আমার কাজ মাটির উপর সেখানে একজন সাধারণ লোকের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়—কারণ ওখানকার বাতাস এত হালকা যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। তাছাড়া এত ঠাণ্ডা যে লোকে জমে যাবে।

কিন্তু বাবা, তোমার তো কিছু হয় না।

তার কারণ আমি সেইভাবে তৈরী হয়ে যাই। বিশেষ ভাবে তৈরী পোষাক পরি, তাতে আলাদা অক্সিজেন থাকে। গরম থাকার ব্যবস্থা আছে। জুতোও এমনভাবে তৈরী যাতে মাটির উপর দিয়ে হাঁটা যায়। তাছাড়া মাটির উপর কাজ করার জন্য আমি বিশেষ প্রশিক্ষণও নিয়েছি।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটির উপরেই বসবাস করতেন। বহু লক্ষ বছর ধরে তাঁরা তাই

করে এসেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হল। যে সূর্যই ছিল আমাদের বেঁচে থাকার উৎস সেই সূর্যই বিরূপ হল। সূর্যের পরিবর্তনটা ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার পথে এই গ্রহে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল।

প্রথমে পাখীদের বংশ লোপ পেল, ক্রমে লুপ্ত হল অন্য সব জন্তু। মাছেরাও এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারল না। আমরা বেঁচে গেলাম কেবলমাত্র উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার জোরে। কিন্তু আমাদের মাটির তলায় কৃত্রিম পরিবেশ তৈরী করতে হল। সৌরশক্তির কল্যাণে আমরা জীবনকে আরামপ্রদ রাখার সব ব্যবস্থাই করতে পেরেছি। কিন্তু যে যন্ত্রে এই সব কাজ হচ্ছে সেগুলি ঠিকঠাক রাখা দরকার। তার অনেকগুলো আছে মাটির উপরে। যাদের উপর এই যন্ত্র দেখাশোনার দায়িত্ব আমি হলাম তাদেরই একজন।

বাবা, আমি কি বড় হলে এই দলে যোগ দিতে পারি?

নিশ্চয়ই পার তিল্লু। তবে তার জন্য তোমাকে ভাল হতে হবে; বাবা-মার কথা শুনতে হবে, যথারীতি মা শেষ মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিলেন।

পরের দিন কাজে গিয়ে তিল্লুর বাবা দেখেন কণ্ট্রোল রুমে দারুণ উত্তেজনা। সবাই বিরাট টিভির পর্দা ঘিরে বসে। এমনিতে পর্দার যেখানটা সাদা থাকার কথা তাতে একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

আগের শিফটের সুপারভাইজার জানালেন এটা তারা নয়, কারণ অবস্থান বদলে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটারে এই জিনিসটার গতিপথ দিয়েছে। এটা সোজা আমাদের দিকেই আসছে।

তিল্লুর বাবা জিগেস করলেন, এটা কি একটা মহাকাশ যান? ততক্ষণে তাঁর শিফটের অন্য সকলে এসে যোগ দিয়েছে।

তাই তো মনে হয়; তবে ভাল করে নজরে রাখতে হবে।

মহাকাশ যান? কিন্তু কোথা থেকে? সৌর জগতে এই গ্রহ ছাড়া আর কোথাও তো প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে জানা নেই। কেন্দ্রীয় ব্যুরোর আর্কাইভে রাখা পুরোনো রেকর্ড থেকে জানা যায় পূর্ব পুরুষদের মহাকাশ যাত্রার পরিকল্পনা ছিল। তাঁরা মানুষ এবং যন্ত্র সমেত মহাকাশ যান পাঠিয়ে সমস্ত সৌর জগৎ চষে ফেলেছিলেন—এবং দেখেন যে তাঁরা সত্যিই একা। এখন মাটির তলার জীবন এবং শক্তি সংকটের এই দিনে তারা মহাকাশ চর্চা ছেড়ে দিয়েছে। কেবল নিজেদের গ্রহ থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারা।

কিন্তু কারা এই অচেনা আগন্তুক?

সেণ্ট্রাল ব্যুরোর সম্মেলন কথা এত চুপচাপ যে বাইরের লোক ভাববে ঘরে বুঝি কেউ নেই। তা কিন্তু নয়, ঘর লোকে ঠাসা। কিন্তু সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্যরা একেবারে চুপ। তাঁরা জানেন যে কোন মুহূর্তে প্রেসিডেণ্ট একটা জরুরী ঘোষণা করতে চলেছেন।

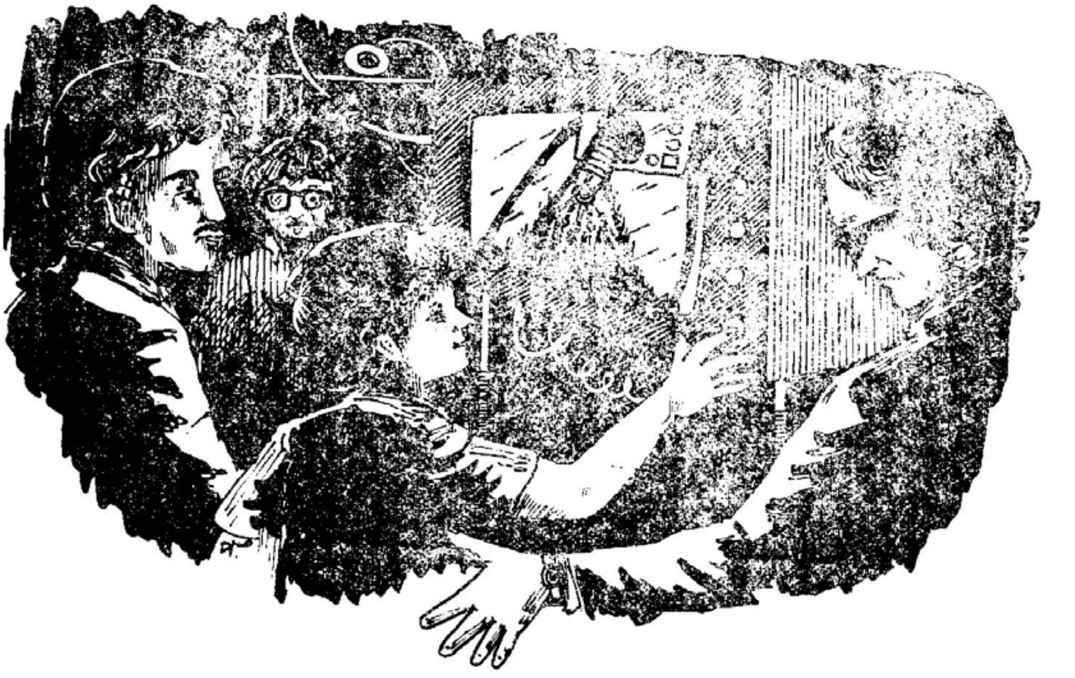

সহকর্মীগণ, আমি রিপোর্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের জানাব। যতক্ষণ আমি কথা বলছি তার মধ্যে পরিস্থিতির বদল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট কাগজপত্র গুছিয়ে নিলেন তারপর বলে চললেন, দুটি মহাকাশ যান আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটি আমাদের প্রদক্ষিণ করছে অন্যটি খানিকটা দূরে আছে। অনুমান করছি প্রতিবেশী কোন গ্রহ থেকে এদের পাঠান হয়েছে। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য ? এক নম্বর — আপনার মতামত ?

এক নম্বর ছিলেন প্রতিরক্ষা প্রধান। সাহসী এবং বিবেচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি বললেন, চাইলে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে দুটি যানকেই আমরা ধ্বংস করে ফেলতে পারি। তাতে অবশ্য আমাদের লাভ কিছু হচ্ছে না। তাছাড়া ওদের মহাকাশে নষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের নেই। মাটিতে নামা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যখন খুশি আমরা ওদের অকেজো করে ফেলতে পারি। আমাদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ওতে প্রাণী নেই; কেবল যন্ত্র আছে।

কমিটির প্রধান বিজ্ঞানীকে উদ্দেশ্য করে এবার প্রেসিডেন্ট বললেন — দু নম্বর, আপনার মতামত।

আমার মত কোনভাবে ওদের না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া। এদের কে পাঠিয়েছে, তারা কতটা শক্তিধর এসব কিছুই আমাদের জানা নেই। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্ব জাহির না করাই বুদ্ধির কাজ। এগুলি নষ্ট অথবা অকেজো করে ফেলার অর্থ নিজেদের অস্তিত্ব ওদের জানিয়ে দেওয়া।

তিন নম্বর সমাজবিজ্ঞানী। প্রেসিডেন্ট এবার তাঁর দিকে ফিরলেন। সচরাচর তিন নম্বর দু নম্বরের সঙ্গে একমত হন না। কিন্তু আজকের দিনটি ব্যতিক্রম।

আমি দু নম্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। আমি বরং আরো বলব যে মাটির উপরের সব কাজকর্ম যতটা সম্ভব থামিয়ে রাখা হোক যাতে ওরা মনে করে এখানে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের মাটির চেহারা দেখলে সেটাই মনে হবার কথা।

প্রেসিডেন্ট উত্তর দেবার আগেই তাঁর ব্যক্তিগত ফোন বেজে উঠল। তিনি রিসিভার তুলে এক মিনিট কোন কথা না বলে শুনে গেলেন। তারপর বললেন সহকর্মীগণ— প্রথম মহাকাশ যানটা নেমেছে।

তিল্লুর জীবনে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাবা ওকে অবশেষে কনট্রোল রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে সে টিভির পর্দায় অচেনা মহাকাশ যানটি দেখছিল।

কি মজার দেখতে ওটা, বাবা, কি আছে ওর মধ্যে ?

বাবা মাথা নাড়লেন। বলা মুশকিল। আমাদের বলা হয়েছে কেবল লক্ষ্য করতে। অবশ্য আমরা যদি মনে করি ওটা কোন ক্ষতি করতে চাইছে তাহলে ওর সমস্ত অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও হাতে আছে। এই বলে তিনি অনেকগুলো রঙিন বোতামের একটি প্যানেল দেখালেন। তিল্লু লুব্ধ দৃষ্টিতে সেগুলি দেখল।

বাবা, দেখ, দেখ ওরা কি করছে—তিল্লু দেখতে পেয়েছে মহাকাশ যানের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করছে। কনট্রোল রুমে অন্য সকলেও সেটি দেখতে পেয়েছে। সকলের দৃষ্টি পর্দায় আটকে আছে।

মহাকাশ যান থেকে একটি যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। গ্রহের মাটি স্পর্শ করল। কি করতে চায় ? সকলে পর্দার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। হাতের উপর ক্যামেরা জুম করল।

তিল্লুর দৃষ্টি কিন্তু কনট্রোল প্যানেলের লাল নীল বোতামগুলির দিকে। লালটা সবচেয়ে বড়। প্রাণপণ ইচ্ছে হল তিল্লুর সেটিকে টেপার। সে হাত বাড়িয়ে দিল—

তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ, সবাই তিল্লুর দিকে ছুটে এল। বাবা তাকে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে বোতামটি আবার আগের অবস্থায় করে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে।

মহাকাশ যানের যান্ত্রিক হাতটি নিশ্চল হয়ে গেছে।

নাসার প্রেস কনফারেন্সে একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর সাংবাদিকদের বুঝিয়ে বলছিলেন—

ভাইকিং মিশনের সব কাজ সুচারুরূপে চলছে। কেবল একটি ছোট গোলমাল দেখা দিয়েছে। যে যান্ত্রিক হাতটি মঙ্গলের মাটি খুঁড়ে আনার কথা তাতে কিছু গোলযোগ হবার ফলে সেটি কাজ করছে না—কেন এটা হল আমরা জানি না, তবে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা এই কারণটা খুঁজে বার করবে নিশ্চয়।

অল্পক্ষণ পরেই নাসা থেকে আর একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হল—"যান্ত্রিক হাতটি আবার কাজ করছে আমাদের প্রযুক্তিবিদদের চেষ্টার ফলে। এখন মাটির নমুনা তোলা ও পরীক্ষার কাজ চলছে—আশা করা যায় মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর শিগগির পাওয়া যাবে।"

মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব ? সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের মধ্যে মঙ্গলই অবস্থান ও প্রকৃতিতে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি। ভাইকিং মিশনের বিজ্ঞানীরা তাই আশা করেছিলেন মঙ্গলে প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হল না। ভাইকিং মিশনে মঙ্গলে প্রাণের কোন চিহ্নই খুঁজে পেল না।

অনুবাদ : এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

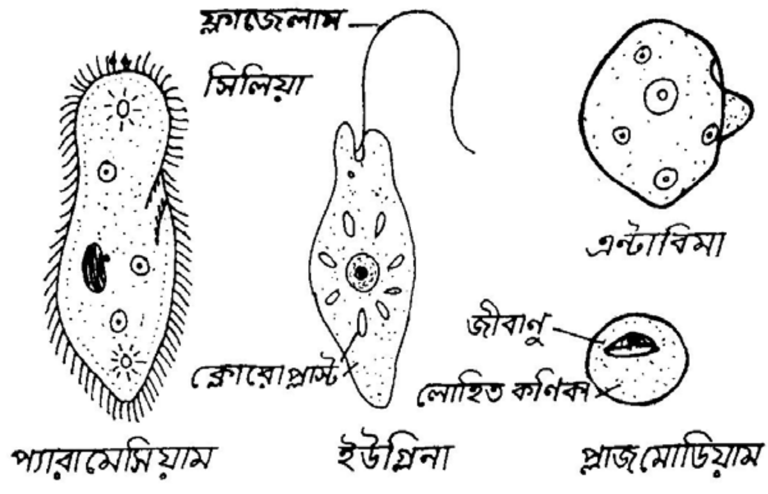

পৃথিবীর প্রথম প্রাণী প্রোটোজোয়া

রমেন মুখোপাধ্যায়

প্রোটোজোয়া এই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণী, তাই এদের বলা হয় 'আদ্যপ্রাণী' (গ্রীক, প্রোটোস = আদি, জুন = প্রাণী) 1674 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লিউয়েন হুক (Leewen hock) তাঁর নিজের তৈরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রোটোজোয়া পর্যবেক্ষণ করেন। 1882 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী গোল্ডফাস এদের নামকরণ করেন 'প্রোটোজোয়া'। এখনও পর্যন্ত প্রোটোজোয়ার প্রায় আশি হাজার (80,000) প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে ; সম্ভবতঃ অনাবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা আরো বেশী। এদের সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানীদের কৌতূহল খুব বেশী, কারণ প্রোটোজোয়া আকারে খুব ছোট হলেও এদের দেহের গঠন ও কার্যপ্রণালী খুব সরল নয়। আসলে একটি বড় প্রাণীর দেহের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ এদের একটি কোষের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। তাই প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের ধারা জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হয় প্রোটোজোয়াকে।

পৃথিবীর নানা জায়গায়, বিভিন্ন পরিবেশে, প্রোটোজোয়া দেখা যায়। বেশীর ভাগ প্রোটোজোয়াই বাস করে জলে, তবে ভিজে মাটির নিচেও অনেক প্রোটোজোয়া বাস করতে পারে, কোনো কোনো প্রোটোজোয়া আবার পরজীবীরূপে অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে ও তাদের দেহে নানারকম রোগের সৃষ্টি করে, যেমন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু 'প্লাজমোডিয়াম'। এই জীবাণুটি স্ত্রী এনোফিলিস মশার লালার সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে ও মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে। মানুষের আমাশা রোগের জীবাণু 'এণ্টামিবা হিস্টোলাইটিকা' ও আরেকটি পরজীবী প্রোটোজোয়া। এরা কাঁচা শাক সবজি বা ময়লা জলের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে।

প্রোটোজোয়া দেখতেও হয় নানা রকমের। কেউ গোল, কেউ লম্বাটে, কেউ ডিমের মতন, কারোবা নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। কারো দেহে একটি নিউক্লিয়াস, কারো বা একাধিক। পুকুর, ডোবা অথবা বর্ষাকালে জমা হওয়া জলের মাধ্যমে অ্যামিবা দেখা যায়, তার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এর দেহের যে কোনো দিক থেকে এক বা একাধিক আঙুলের মত বেরিয়ে আসে—এগুলোকে বলা হয় ক্ষণপদ। এই ক্ষণপদের সাহায্যে এরা চলাফেরা করতে পারে। আবার কোনো খাদ্যবস্তু এদের সামনে এলে এই ক্ষণপদের সাহায্যে এরা একটি পেয়ালার মত আকার তৈরী করে খাদ্যকে দেহের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। খাদ্য তখন দেহের মধ্যে খাদ্য-গহ্বরে পরিণত হয়। পরিণত অ্যামিবার দেহটি মাঝামাঝিভাবে দুটি অংশে ভাগ হয়ে যায়—একে দ্বিভাজন বলা হয়। শুধু অ্যামিবা নয়, পুকুরের জলে অন্য যে সব প্রোটোজোয়া পাওয়া যায়, যেমন—প্যারামেসিয়াম বা ইউগ্লিনা ; তারাও এই দ্বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে।

প্যারামেসিয়াম এককোষী প্রাণী হলেও এর দেহে দুটি নিউক্লিয়াস থাকে, একটি ছোট অন্যটি বড়। এদের দেহটি ডিম্বাকার। সারা দেহ ছোট ছোট শুঁয়া বা সিলিয়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এই সিলিয়ার আন্দোলনে এরা তীরবেগে জলের মধ্যে ছুটোছুটি করতে পারে। এতটুকু দেহ হলেও এদের দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় মুখছিদ্র আছে। সিলিয়ার আন্দোলনে খাদ্য এসে এই মুখছিদ্রে প্রবেশ করে ও দেহের ভেতরে প্রবেশ করে খাদ্যগহ্বর তৈরী করে। খাদ্য হজম হয়ে গেলে অপাচ্য অংশ একটি নির্দিষ্ট পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। কখনো কখনো দুটি প্যারামেসিয়াম পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিউক্লিয়াসের অংশ বিনিময় করে ও এইভাবে বংশবৃদ্ধি করে। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্যারামেসিয়ামকে জটিল প্রোটোজোয়া বলা হয়।

জোয়ার ভাটা

নীহার ভট্টাচার্য্য

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আমাদের এই পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার খেলা চলে আসছে। এই জোয়ার-ভাটার সঙ্গে মানব সভ্যতার পরিচয়ও অনাদি কাল থেকে। একমাত্র গ্রীস দেশের লোকেরা এ ব্যাপারে হদিস পেয়েছে বহুকাল পরে, খ্রিষ্ট পূর্ব 325 নাগাদ। প্রাচীন গ্রীকদের এই প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হতে এতটা সময় লাগবার কারণ এই নয় যে তারা ও সব ব্যাপারে উদাসীন ছিল। বরং উল্টো। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা খুবই উন্নত ছিল। সেই সময়ের গ্রীকরা যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ করত এবং সেসব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত। তবুও জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে এতদিন সময় লেগেছিল, কারণ তাদের উপকূলে লক্ষ করবার মত জোয়ার-ভাটা ঘটতো না, সত্যি কথা বলতে কি, এখনো ঘটে না।

ভাবতে আশ্চর্য লাগতে পারে, বলতে গেলে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত এই দেশে নজর পড়বার মত জোয়ার-ভাটা ঘটে না। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই কিন্তু আর আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। গ্রীস দেশের অবস্থান ভূমধ্য সাগরের ভেতরে ; আর এই ভূমধ্য সাগরটা দেখতে আসলে খণ্ড এক হ্রদের মত। অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের সাথে যোগাযোগ একমাত্র জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে। সেই জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে জোয়ারের জল ভূমধ্য সাগরে এসে পড়তে যে সময় লাগে তার আগেই আবার ভাটা শুরু হয়ে যায়। তাই ভূমধ্য সাগরে সহজে নজরে আসবার মত জোয়ার-ভাটা নেই।

প্রাচীন গ্রীস-এর মাসালিয়ার অধিবাসী ছিলেন পিথেয়াস। তাঁর নেশা ছিল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান আর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈজ্ঞানিক। খ্রিঃ পূঃ 325-এ তিনি হাজির হয়েছিলেন এ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে। সেখানেই তিনি প্রথমে জোয়ার-ভাটার প্রকোপ লক্ষ করেন। লক্ষ করেন, দিনে দুবার করে মহাসাগরের জল যেন উপচে পড়তে চায়, জোয়ার ; আবার দিনে দুবার করে সেই জল-রাশি যেন কোথায় উধাও হয়, জল অনেকটা নেমে যায়, ভাটা। দুই জোয়ারের পর দুই ভাটা। পিথেয়াস মন-যোগ দিয়ে এই প্রাত্যহিক ঘটনা লক্ষ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে সাহায্য করে, যদিও তাদের কাছে ব্যাপারটা দিনের শেষে রাত আসবার মতই অনিবার্যভাবে স্বাভাবিক মনে হতো।

পিথেয়াস-এর কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যা মনে হয়েছিল, তা হচ্ছে, জোয়ার বা ভাটা প্রতিদিন দুবার করে ঘটলেও ও দুটো ঘটনা প্রতিদিন একই সময়ে ঘটতো না এবং জোয়ার আর ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও এক নয়। আর প্রতি মাসে দুবার করে জোয়ার-ভাটার প্রকোপ রীতিমত বেশী এবং সেই দুই জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি সময়ে দুবার করে সেই প্রকোপ বেশ কম। তাছাড়া এই বিশেষ দাপটের জোয়ার বা ভাটা প্রতি মাসের একই দিনে হতো না। সেখানে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। জোয়ারের প্রকোপ পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে সবচেয়ে বেশী হতো, আর অমাবস্যা-পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়ে তা সবচেয়ে কম হতো। (এ সবই অবশ্য এখনো ঘটে।) এইসব প্রত্যক্ষ করে পিথেয়াস মত প্রকাশ করেছিলেন, জোয়ার-ভাটার কারণ চন্দ্র। চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার-ভাটা হয়। কিন্তু গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী একথা মেনেও নিয়েছিলেন, তবুও কিন্তু পিথেয়াস-এর এই ব্যাখ্যা আরো দু হাজার বছর মত ধামাচাপা পড়ে রইল।

জ্যোতিষ্কগুলির সম্ভব-অসম্ভব যাবতীয় প্রভাব তৎকালীন মানব সমাজ মেনে নিয়েছিল অলৌকিক ঘটনা বলে, সে সবের কোনোরকম ব্যাখ্যা মেনে নেবার প্রধান অন্তরায় ছিল সংস্কার। কুসংস্কার। সাধারণ মানুষের এইসব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে ভাটিকাল শহরের চার্চ। চার্চ-এর প্রতাপ প্রচণ্ড। হয়তো বা সেই কারণেই সাধারণ মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, বা উদাসীন থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া সপ্তদশ শতাব্দী অবধি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লেখা হতো ল্যাটিন ভাষায়। সেই ভাষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী গ্যালিলেও। সেটা অন্য কথা। প্রকৃত ঘটনা, পিথেয়াস-এর জোয়ার ভাটার ব্যাখ্যা প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছেও এই ব্যাখ্যা স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল। মনে হয়, দিনে দুবার করে জোয়ার-ভাটার খেলা। চন্দ্রের অবস্থান যখন মাথার ওপর তখন তার কোনো অলৌকিক আকর্ষণে জল ফেঁপে উঠতে পারে, এ কথা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে,

চন্দ্র যখন অন্য প্রান্তে, অর্থাৎ পায়ের তলের মাটির ওপাশে, তখন তো চন্দ্রের সেই অলৌকিক আকর্ষণে জল সেই প্রান্তে স্ফীত হবে. এটাই তো স্বাভাবিক। তা না হয়ে এ প্রান্তেও আবার জোয়ার, এটা মেনে নেয়া কঠিন। এক হতে পারে, চন্দ্রের অলৌকিক আকর্ষণে এ প্রান্তে জল ফেঁপে ওঠে আর সেই চন্দ্রের আরেক অলৌকিক বিকর্ষণের ফলে ও প্রান্তেও জল ফেঁপে ওঠে। কিন্তু, সেটা আরো অস্বাভাবিক। সুতরাং পিথেয়াস-এর ব্যাখ্যা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামালো না।

প্রায় দু'হাজার বছর পরে এলেন যোহান কেপলার। তিনি ব্যক্ত করলেন তাঁর বিশ্বাসের কথা—এই পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটার ওপর চন্দ্রের প্রভাব আছে। সেটা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। তখন ইয়োরোপে গ্যালিলেও বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্যালিলেও কিন্তু সে কথা মানতে রাজী হলেন না, উপরন্তু ওটা তামাশা বলে উপেক্ষা করলেন। কেপলার ছিলেন জ্যোতিষী, তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনার ওপর চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের অলৌকিক প্রভাবের অস্তিত্বে। গ্যালিলেও ও সবে বিশ্বাস করতেন না, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী। তাঁর যুক্তি ছিল, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে জলরাশি এদিক-ওদিক যাতায়াত করার ফলেই জোয়ার-ভাঁটা দেখা দিত। সেই তত্ত্ব আজ আর কেউ মানবে না, মানবার কোনো উপায় নেই। তাই অসংকোচে বলা যায়, গ্যালিলেও ভুল করেছিলেন।

অবশেষে এলেন নিউটন, তাঁর মহাকর্ষ-তত্ত্ব প্রকাশ করলেন 1685 খ্রিষ্টাব্দে। সেই তত্ত্ব মেনে নিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাব এই পৃথিবীর ওপর আছে এবং তার ফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, মহাকর্ষের প্রভাব স্থলভূমির ওপরও আছে; কিন্তু স্থলভাগে অর্থাৎ কঠিন বস্তুতে আণবিক ব্যবধান তরল পদার্থের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার ফলে সেখানে লক্ষ করবার মত পরিবর্তন দেখা যায় না; অর্থাৎ জলরাশিতে মহাকর্ষের প্রভাব তুলনা মূলকভাবে অনেক বেশী স্পষ্ট।

তবুও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই গেল, জোয়ার দিনে দুবার আসে কেন। চন্দ্র পৃথিবীর যে পাশে অবস্থিত, সেই পাশে তার মহাকর্ষের প্রভাব পড়বে। সেই প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের সেই ভাগের জলরাশি স্ফীত হতে পারে এবং হয়। একথা মানতে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু সেই সময় পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের জলভাগ কেন স্ফীত হবে? সেই পুরোনো প্রশ্ন, একই চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে আকর্ষণ এবং অপর পৃষ্ঠে বিকর্ষণ! তাহলে কি নিউটন শুধু 'অলৌকিক' শব্দের পরিবর্তে 'মহাকর্ষ' শব্দ ব্যবহার করে বিজ্ঞান জগতের প্রায় সমস্ত সমস্যা সমাধান করেছিলেন! পৃথিবীর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত বিজ্ঞানী তা মেনে নিল! সেটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন। তাই নিউটনের তত্ত্বটি আরেকটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে হবে।

মহাকর্ষের শক্তি দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। দূরত্ব বাড়লে শক্তির প্রভাব কমে এবং তা কমে দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে (inverse ratio)। এবার চন্দ্র এবং পৃথিবীর ব্যাপারটা দেখা যাক। চন্দ্রের কেন্দ্রস্থল থেকে ভূপৃষ্ঠের নিকটতম দূরত্ব যখন 234,000 মাইল, তখন ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তের দূরত্ব আরো 8,000 মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের সমান বেশী। তাহলে সেই দূরত্ব দাঁড়ায় 242,000 মাইল। চন্দ্রের নিকটতম পৃষ্ঠের দূরত্বকে 1 ধরলে অপর পৃষ্ঠের দূরত্ব হয় 242,000/234,000 বা 1·034; এবং নিউটন-এর তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ 1 থেকে কমে গিয়ে $1/1{\cdot}034^2$ অথবা 0·93 হয়। মহাকর্ষের তফাৎটা তখন দাঁড়ায় শতকরা 7 ভাগ। অর্থাৎ চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাব নিকটতম ভূপৃষ্ট থেকে দূরতম ভূপৃষ্ঠের ওপর শতকরা 7 ভাগ কম হয়। এবং মহাকর্ষের এই প্রভাব ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে, চন্দ্রের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে ক্রমশ কমতে কমতে ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে সবচেয়ে কম হবে। সেখানে প্রভাব তখন শতকরা 7 ভাগ হয়। তার ফলে

চন্দ্রের নিকটতম ভূপৃষ্টের জলরাশি চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাবে সবচেয়ে বেশী স্ফীত হবে এবং ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তের জলরাশি অনেক কম আকর্ষিত হবার ফলে চন্দ্রের দিকে সামান্য এগোবে। তবুও সেই প্রান্তের আশপাশের জলরাশি চন্দ্রের দিকে অপেক্ষাকৃত বেশী আকর্ষিত হবার দরুণ সেই প্রান্তের জলরাশি তুলনা মূলকভাবে বেশী মনে হবে, স্ফীত মনে হবে।

একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এই ঘটনাটি সহজ এক উদাহরণের সাহায্যে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। একদল দৌড়বাজের কথা ভাবলে দেখা যায়, প্রত্যেকে একই লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে বা আকৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সেই লক্ষ্যস্থলের আকর্ষণে প্রত্যেকে ছুটে চলে। কিন্তু দৌড়বাজ সামনে থাকে কিছু পেছিয়ে পড়ে। সেই দলের মোট আকৃতিটা তখন একটা পটলের মত হয়। ভূ-

পৃষ্ঠে জোয়ারও তেমনি একই বস্তুর আকর্ষণের ফলে একই সঙ্গে চন্দ্রের নিকটতম পৃষ্ঠ এবং দূরতম পৃষ্ঠে ঘটে।

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো বিশেষ সমুদ্রতট এক প্রান্তের স্ফীত জলরাশি থেকে সরে গিয়ে আবার অপর প্রান্তের স্ফীত জলরাশির মধ্যে ঢুকে পড়ে, ফলে আবার জোয়ার দেখা দেয়। মাঝখানটায় ভাটার সময়। এই এ প্রান্তের জোয়ারের এলাকা থেকে অপর প্রান্তের এলাকায় পৌঁছুতে পৃথিবীর আবর্তন অর্দ্ধেক সমাপ্ত হয়, ফলে একই স্থানে দুবার জোয়ার দেখা দেয়। চন্দ্র যদি স্থির থাকত তাহলে এই জোয়ার পৃথিবীর জলরাশিতে প্রত্যেক দিন একই সময়ে জোয়ার আসত দুবার এবং তা আসত ঠিক বারো ঘণ্টা পর। কিন্তু চন্দ্রও স্থির নয়। চন্দ্রও ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে তার নিজস্ব কক্ষপথে এবং পৃথিবীর আবর্তনের দিকে; এবং তার ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে এক জোয়ারের এলাকা থেকে অন্য জোয়ারের এলাকায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সেই অন্য জোয়ার খানিকটা এগিয়ে যায়; কারণ চন্দ্রও এই সময়ের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে যায়। ফলে পৃথিবীকে আরো একটু বেশী ঘুরতে হয়, এবং সেজন্য আরো আধ ঘণ্টা মত সময় বেশী লাগে। প্রথম এবং দ্বিতীয় জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বারো ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মত। দুই দিনের প্রথম জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 24 ঘণ্টা 50 মিনিট।

এবার প্রশ্ন, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে জোয়ারের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়। তেমনি চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জোয়ারের প্রকোপের একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। এর কারণ খুঁজতে গেলে সূর্যকে রঙ্গমঞ্চে আনতে হবে। সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবও পৃথিবীর ওপর আছে। মহাকাশের দুই জ্যোতিষ্ক সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভাব পৃথিবীর ওপর দুই রকমে হয়—ঐ দুই জ্যোতিষ্কের ভর এবং ওগুলোর প্রতিটির দূরত্ব সেখানে কাজ করে। ভরের প্রভাব সরাসরি ভাবে, দূরত্বের প্রভাব, আগেই বলা হয়েছে, দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাত অনুসারে বাড়ে বা কমে। দূরত্বের মাপ কেন্দ্র বিন্দু থেকে নিতে হয়।

সূর্যের ভর চন্দ্রের চেয়ে 27,000,000 গুণ বেশী এবং পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব চন্দ্রের তুলনায় 392 গুণ বেশী। তাহলে চন্দ্রের ভর এবং পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব, উভয়কেই একক ধরে বলা যায় সূর্যের ভর 27,000,000 চান্দ্র ভর এবং দূরত্ব 392 চান্দ্র-দূরত্বের সমান—সেক্ষেত্রে পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাব হবে $1/1^2$ বা 1। সুতরাং পৃথিবীর ওপর সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাব দাঁড়াচ্ছে $27,000,000/392^2$ বা 176, অন্য কথায় চন্দ্রের চেয়ে 176 গুণ বেশী। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার ওপর সূর্যেরও প্রভাব আছে এবং তার ফলে পৃথিবীর দুই পৃষ্ঠে জোয়ার-ভাটা ঘটে।

অমাবস্যাতে চন্দ্র এবং সূর্য পৃথিবীর একই দিকে থাকে এবং ঐ দুই জ্যোতিষ্কের সম্মিলিত প্রভাবে জোয়ারের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়। আবার পূর্ণিমাতে দুই জ্যোতিষ্ক দুই দিক থেকে পৃথিবীর ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে, ফলে আবার জোয়ারের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এখানে বলে রাখা দরকার, জোয়ারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে ভাটায় জল অনেক বেশী নামবে, কারণ ভূপৃষ্ঠে জলরাশি বিশাল হলেও সীমিত।

অমাবস্যা-পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ যখন আমরা অর্দ্ধ চন্দ্র দেখি, তখন সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুগুলি যোগ করলে এক সমকোণী ত্রিভুজ হয়। তাহলে সূর্য যদি পৃথিবীর বাঁদিকে থাকে তবে পৃথিবীর বাঁয়ে এবং ডাইনে জোয়ার হবে। আর সেই সময়ে চন্দ্র যদি আমাদের মাথার ওপর কিম্বা পায়ের নিচে পৃথিবীর ওপাশে থাকে, তাহলে জোয়ার হবে ওপরের এবং নিচের দিকে। এই দুটি ক্ষেত্রেই চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাব সূর্যের মহাকর্ষের ফলে কিছুটা ব্যাহত হবে, ফলে জোয়ারের প্রকোপ সবচেয়ে কম হবে। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করতে হবে, "চন্দ্রের মহাকর্ষের প্রভাব সূর্যের মহাকর্ষের ফলে কিছুটা ব্যাহত হবে"। অর্থাৎ পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার ব্যাপারে চন্দ্রের প্রভাব সূর্যের চেয়ে বেশী। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও কথাটা ঠিক। পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার ব্যাপারে চন্দ্রের প্রভাবকে সূর্য কিছুটা ব্যাহত করে, তবে কখনই চন্দ্রের প্রভাবমুক্ত করতে পারে না।

একটু খতিয়ে দেখলেই এই আপাত অসম্ভব ব্যাপারটার কারণ পাওয়া যাবে। জোয়ার-ভাটার একমাত্র কারণ মহাকর্ষের টান নয়। তার কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সেই মহাকর্ষের প্রভাবের তারতম্য। এই তারতম্য দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। সূর্যের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 92,900,000 মাইল। এই বিশাল দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর ব্যাস নগণ্য। সূর্যের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটতম দূরত্ব গড়ে যদি 92,896,000 মাইল ধরা যায় তাহলে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের দূরত্ব হবে 92,904,000 মাইল। সূর্যের কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের নিকটতম দূরত্ব 1 ধরলে অপর পৃষ্ঠের দূরত্ব হবে 1·00009 এবং সেই ব্যবধানের ফলে মহাকর্ষের প্রভাব কমে মাত্র 1/1·00009 বা 0·99982; শতকরা সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবের তফাৎ মাত্র 0·018 ভাগ। পৃথিবীর ওপর সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাব চন্দ্রের তুলনায় 176 গুণ বেশী। এবার 0·018কে 176 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় শতকরা 3·2 ভাগ। পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার ওপর চন্দ্র এবং সূর্যের প্রভাবের অনুপাত তাহলে দাঁড়ায় 7 ঃ 3·2; অর্থাৎ চন্দ্রের প্রভাব দ্বিগুণেরও বেশী।

পিথেয়াস যেটা ধারণা করেছিলেন, নিউটন-এর মহাকর্ষ তত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করল।

প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা

সুবীর চক্রবর্তী

প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হল সেই সংখ্যা যা বাম দিক থেকে পড়লেও যা ডান দিক থেকে পড়লেও তাই হবে। অর্থাৎ সংখ্যাটিকে উল্টে লিখলে একই থাকবে। যেমন 646, 13331 ইত্যাদি।

এক অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক বলতে কিছু বোঝায় না। দু' অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা বলতে বোঝায় দুটোই একই অঙ্কের সংখ্যা অর্থাৎ 11 বা তার গুণিতক। দু' অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হল ন'খানা। তিন অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হল 90 খানা। দু'অঙ্কের ক্ষুদ্রতম প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হল 101 যা একটি মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা হল এমন সংখ্যা যা একের চেয়ে বড় এবং এক ও সেই সংখ্যা ছাড়া আর কোন উৎপাদক নেই।

প্যালিনড্রোমিক মৌলিক সংখ্যার উদাহরণ :

11, 101, 10301, 10501, 10601, 11311, 11411, 12421, 30103, 30203, 9931399, 9932399 ইত্যাদি।

প্যালিনড্রোমিক বর্গ সংখ্যার উদাহরণ :

121, 484, 676, 10201, 12321, 69696 ইত্যাদি।

প্যালিনড্রোমিক ঘন সংখ্যার উদাহরণ :

343, 1331, 1030301, 1066252601 ইত্যাদি।

এখন যে কোন সংখ্যা নিয়ে উল্টে লিখে যোগ করা হল। যোগফল যদি প্যালিনড্রোমিক না হয় তাহলে যোগফলটিকে উল্টে লিখে আবার যোগ করা হল। এভাবে করতে থাকলে সবক্ষেত্রেই এক সময় না এক সময় প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হয়।

উদাহরণ : (1) $34+43=77$ (2) $49+94=143+341=484$ (3) $68+86=154+451=605+506=1111$

দেখা যাচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে, দ্বিতীয় উদাহরণে দ্বিতীয় ধাপে, তৃতীয় ক্ষেত্রে তিনটে ধাপে প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা পাচ্ছি। এভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে দু'-অঙ্কের বেলায় অঙ্ক দুটোর যোগফল যদি দশের কম হয় তাহলে প্রথম ধাপেই দু'অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক পাওয়া যায়। অঙ্ক দুটোর যোগফল যদি দশ বা তার বেশী হয় হয় তাহলে কি হয় নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

অঙ্ক দুটোর যোগফল	কতকগুলো ধাপ লাগবে	প্যালিনড্রোমিক সংখ্যার অঙ্ক কটি
10, 11, 12,	2, 1, 2,	3, 3, 3,
13, 14, 15,	2, 3, 4,	3, 4, 4,
16, 18	6, 6	5, 5

কিন্তু দেখা গেছে অঙ্ক দুটির যোগফল যদি 17 হয় অর্থাৎ 89 (অথবা 98) সংখ্যাটির ক্ষেত্রে 24টি ধাপের প্রয়োজন এবং প্যালিনড্রোমিক সংখ্যাটি হবে 13 অঙ্কের 1 সংখ্যাটি হল : 8813200023188.

এভাবে প্রাপ্ত সব প্যালিনড্রোমিক সংখ্যাগুলি 11 দ্বারা বিভাজ্য। একজন অঙ্কবিদ চার্লস ডারুই ট্রিগ বলেছেন দশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে মাত্র 249টা এমন সংখ্যা আছে যার 100 ধাপের পরও প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা দেয় না। এখন কিছু বিশেষ উদাহরণ দেওয়া যাক যেখানে একটি বর্গ সংখ্যা থেকে শুরু করে একটি বর্গ প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

(1) 49 একটি বর্গ সংখ্যা উপরের প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে দ্বিতীয় ধাপে পাই একটি প্যালিনড্রোমিক 484 যেটা ঘটনা চক্রে আর একটি প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা 22 এর বর্গ।

(2) 64 হল 8-এর বর্গ। উপরের পক্রিয়া অবলম্বন করলে দ্বিতীয় ধাপে পাব 121 যা আবার 11 এর বর্গ।

(3) $729=27^2$

$729+927=1656+6561=8217$

$8217+7128=15345+54351$

$=69696=(264)^2$

1296 (36^2) কিম্বা 6561 (81^2) থেকেও 69696 পাওয়া যায়।

836 হল তিন অঙ্কের সবচেয়ে বড় সংখ্যা যার বর্গ হল 698896.

আমরা জানি—$11^2=121$ $11^3=1331$ $11^4=14641$

কিন্তু 11^5 প্যালিনড্রোমিক নয়। অনুমান করা হয় এমন কোন সংখ্যা পাওয়া যাবে না যার পঞ্চম বা তার বেশী ঘাত (power) একটি প্যালিনড্রোমিক হবে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল জোড় সংখ্যক অঙ্ক বিশিষ্ট কোন প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা মৌলিক হতে পারে না একমাত্র 11 ছাড়া। এটা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

মনে করি চার অঙ্কের একটি প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হল abba. অর্থাৎ $1000a+100b+10b+a$ অথবা $1001a+110b=11(91a+10b)$ অর্থাৎ সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য।

উইপোকার কেরামতি

খোঁজ খবর

ইংরেজিতে উইপোকাকে বলে হোয়াইট অ্যান্ট। কারণ এদের জীবনযাত্রার সংগে পিঁপড়েদের খুবই মিল। কিন্তু এদের গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। দেখতে সাদা, নরমদেহী। মুখে কামড়াবার দাঁড়া আছে। পিঁপড়েদের মতো সঙ্ঘবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপন করলেও এরা আলাদা বর্গের। সমান মাপের এক জোড়া ডানা থাকে, কারোও কারোও আবার থাকে দু'জোড়া ডানা। একমাত্র রাণী উইপোকারই আকার 4 থেকে $4\frac{1}{2}$ ইঞ্চির মতো হয়। আর সব সৈন্য ও কর্মী উইপোকার মাপ $1\frac{1}{2}$ মিলিমিটারের মধ্যে।

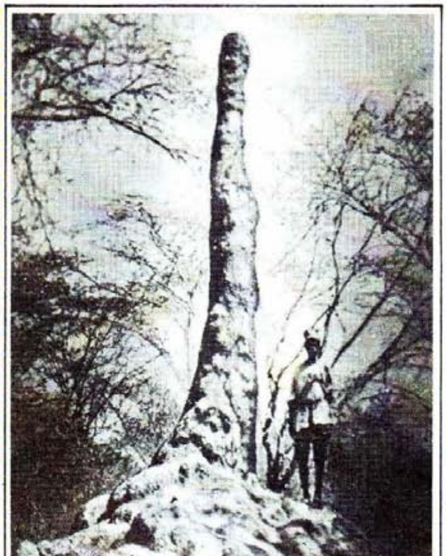

এই ক্ষুদ্রাকার প্রাণীদের ক্ষমতা কিন্তু অসাধারণ। উপরের ছবিটা দেখে হয়তো কোন উঁচু মিনার বলে মনে হতে পারে। আসলে এটি তৈরী করেছে সেই দেড় মিলিমিটার আকারের ক্ষুদ্র প্রাণীরাই। খালি মাটির সাহায্যে মুখের লালা দিয়ে তৈরি ছ'মিটার উঁচু এই মিনারটি আসলে একটি উইঢিবি, যা মানুষের তৈরি কংক্রিটের মতোই সুদৃঢ়। ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তী (Wonder of Animal Life) র. ব.

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
হিঃ-হিঃ-হিঃ। এই টয় ক্যামেরাটা দিয়ে আজ একটা মজা করবো। ঐ খুদে আসছে! আমি ফোটো তোলার ভান করি।
আরে, গদা ফোটো তুলছে! দেখি তো কেমন তোলে।
এ্যাই! কে-কেরে? খুদে!
হতচ্ছাড়া, তুই আমাদের ছেড়ে অন্য লোকের ফোটো তুলচ্ছিস?
তোদেরকেই তো খুঁজছিলুম। দাঁড়া, তোর একটা শট নিই।
তুই আবার কবে থেকে এ কম্মো শুরু করলি? দেখি, কেমন ক্যামেরাটা
হুম্, বক্স ক্যামেরা! তবে ক্যামেরা গলায় ঝোলালেই ফোটোগ্রাফার হওয়া যায় না এর অনেক খুঁটিনাটি জানার আছে-
লেন্স, শাটার, ভিউফাইণ্ডার আর ডায়াফ্রাম। এ ক'টার উপর তোর কন্ট্রোল থাকলেই হয়ে গেল।
সে সব আমার আছে।
কোথায় আছে? বার কর তো দেখি
বাড়িতে রেখে এসেছি পরে দেখাবো
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ

কন্ট্রোল তোর বাড়িতে, পরে দেখাবি- হিঃ-হিঃ-হিঃ-
যাঃ ব্বাবা, তোকে ভূতেতে ধরল নাকি?
গলায় ক্যামেরা না ঝুলিয়ে ঘুঁটের মালা ঝুলেগে যা, বুদ্ধু কাঁহেকা!
ঘুঁটের মালা! ঝোলাতে হয় তুই ঝোলাগে যা। দিয়ে দে আমার ক্যামেরা –
আঃ হা, রাগছিস কেন গদু, আমি তোর সঙ্গে ইয়ারকি করছিলুম।
আমি একটা ফোটো তুলেই দিয়ে দেব। এর মধ্যে রিল ফিল্ম ভরেছিস নিশ্চয়ই?
হ্যাঁ, নে চটপট তোল্
অত তড়বড় করলে হবে না। এটা একটা আর্ট। সুতরাং প্রথমেই তোর সাবজেক্টটি ভিউফাইণ্ডারে ঠিক আসছে কিনা সেটা তোমার আর্টিস্টিক সেন্স দিয়ে দেখে নাও। তারপর লাইট এণ্ড ডিস্ট্যান্স নির্ণয় করে ডায়াফ্রাম এ্যাডজাস্ট কর। এবার দৃঢ় হাতে শাটারে আলতো চাপ দাও –
ফ্যাচাং
এটা কি হল?
এখন তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তোর ভিতরে সব আর্টিস্টিক সেন্স বাইরে উপচে পরেছে। ওটা জল ভরা টয় ক্যামেরা– শাটার ছাড়া তোর ঐ হাবিজাবি কিচ্ছুই নেই, হাঁদারাম!
আমার মনে হয়, এটা কোন ভৌতিক ক্যামেরা!

এবার এলেন ভিয়েনায়। তারাও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার দেখে মুগ্ধ
তোমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর কারখানা নিশ্চয় খুব উন্নত মানের ?
এই রকম যন্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে।
হায়রে এরা জানেনা, নিজের পয়সা খরচ করে এবং কত পরিশ্রম আর বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী করেছি !
মিঃ বোস, আমার ছাত্রদের কয়েকটা প্রশ্ন আছে। দয়া করে উত্তর দিলে ওরা উপকৃত হবে।
বেশ তো-
একে একে ছেলেরা তাদের প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে
—বেশ কয়েক বছর ধরে এই প্রশ্নগুলির উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। প্রশ্নগুলি খুবই কঠিন
তুমি আমার "রিসার্চস, অন, দ্য ইরিট্যাবিলিটি অব প্ল্যান্টস" বইটার একশো ছিয়ানব্বুই পৃষ্ঠা খুলে দেখ।
আশ্চর্য্য ! এই তো, পেয়ে-গেছি !
বোঝার সুবিধার জন্য ওতে কিছু ডায়াগ্রামও দেওয়া আছে।
—এই প্রশ্নটার উত্তরের জন্য আমিও বহুদিন ঘুরেছি—
তুমি ঐ বইটার কুড়ি নম্বর থেকে তেইশ নম্বর পরিচ্ছেদ মন দিয়ে পড়ে যাও। তাতেই সব পাবে।
!!
আপনার কাছ থেকে ছাত্ররা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হল।
এখন যদি আপত্তি না থাকে, ভারতে তোমার ল্যাবোরেটরীতে কাজ করতে কিছু ছাত্র পাঠাতে চাই।
ভারতে আমার ল্যাবোরেটরী! ইচ্ছা আছে একটা কিছু করার, কিন্তু অত টাকা কোথায় ? দেবেই বা কে? সামনেই রিটায়ার করার দিন। এর পর হয়ত আর রিসার্চই করতে পারবো না—
কি হল, আপনি চুপ করে আছেন কেন মিঃ বোস ?
না-না, তবে আপনার উত্তর আজ নয় সময় এলে দেব।

বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

।চৌদ্দ।

এনজেলো! এনজেলো!

প্রিয়বর্ধন আমার সঙ্গে এল না। বলল, 'শয়তান ক্যারিবো আর ওই দুই ওরাংওটাংকে উদ্ধারের একটুও ইচ্ছা আমার নেই জয়ন্ত! ওরা উচিত শাস্তি পেয়েছে। বরং ততক্ষণ আমি মোটর বোটটা মেরামত করতে থাকি।'

আমার মন বলছিল, এ দ্বীপে আমি নিরাপদ। এই বিচিত্র সুন্দর বনভূমি আমার অসংখ্য বন্ধুতে ভরা। তারা মানুষের মতো করে কথা না বলতে পারলেও নিজেদের মতো করে কথা বলে। আমার চেতনায় অনুরণিত হচ্ছে তাদের মনের কথা। প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি, ওরা বলতে চাইছে, 'তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের প্রিয় অতিথি।'

এক বিশাল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তার গায়ে হাত রাখলুম। আবার চমকে উঠলুম। যেন কোন প্রাণীর শরীর। মনে মনে বললুম, 'আমি কোনো ক্ষতি করতে আসিনি তোমাদের। আমার মনে রোজারিওর গুপ্তধনের বিন্দুমাত্র লোভ নেই।'

আশ্চর্য, আমার চেতনায় কী একটা বোধ সঞ্চারিত হল তখনই। যেন এই বৃদ্ধ প্রপিতামহ বৃক্ষের সস্নেহ কিছু আশীর্বাদ বাক্য অস্পষ্টভাবে অনুভব করলুম। তারপর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললুম বনের ভেতর দিয়ে। আমার সাহস চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেউ সামনের দিক থেকে হঠাৎ খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো!' অমনি থমকে দাঁড়ালুম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ক্যাপ্টেন জর্জ ব্যাগানভিলিও ঠিক এই ডাক শুনেছিলেন কিওটা দ্বীপে। তাহলে এও প্রাচীন যুগের সম্ভবত কোনো নাবিকেরই কণ্ঠস্বরের ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি। একটু হাসিও পেল। এক রাজার কান দুটো দেবতার অভিশাপে গাধার কানে পরিণত হয়েছিল। নাপিত ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। কিন্তু কাউকে বললেই তো গর্দান যাবে। শেষে মাঠের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ফিসফিস করে বলেছিল, 'রাজার কান দুটো গাধার।' কিছুকাল পরে সেখানে গজালো একটা নলখাগড়ার ঝোপ। আর বাতাস বইলেই সেই ঝোপ থেকে ফিসফিস করে উচ্চারিত হত, 'রাজার কান দুটো গাধার!' প্রাচীন এশিয়া মাইনরের হিটাইট দেশের মিতান্নি গোষ্ঠীর রাজা মিদাসের গল্প এটা। 'কিং মিদাস হ্যাজ অ্যাসেস ইয়ারস!' নলখাগড়ার ঝোপটা ফিসফিস করে বাতাসের সুরে ঘোষণা করত।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, উদ্ভিদের এই বেয়াড়া স্বভাবের কথা যেন প্রাচীন যুগের মানুষরাও অন্তত আঁচ করতে পেরেছিল।

কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে আবার সামনে থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো!' এবার ওই ডাকে খুব ব্যাকুলতা আছে যেন। 'এনজেলো! এনজেলো! কাম অন! কাম অন!

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কে তুমি ডাকছ এনজেলো বল? আমি এনজেলো নই।'

'এনজেলো! ফলো মি।'

কেউ এনজেলোকে বলছে, 'আমাকে অনুসরণ করো।' আমি অবাক হয়ে হাঁটতে থাকলুম। কথাগুলো ক্রমশ আমার আগে-আগে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছি। একটু পরে টিলা পাহাড়ের কাছে পেঁছিলুম। সামনে একটা ফাটল। ফাটলের দুধারে কেয়াগাছের মতো দেখতে একরকম গাছ সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, ওই গাছগুলোর ভেতর থেকে 'এনজেলো' বলে ডাক ভেসে আসছে। এবার গা ছমছম করতে থাকল। এ যে শেষ পর্যন্ত ভৌতিক ঘটনা হয়ে যাচ্ছে! কোনো অশরীরী মানুষ যেন আমাকে এনজেলো ভেবে কোথায় ডেকে নিয়ে চলেছে।

আবার ইংরেজিতে সেই অশরীরী ফিসফিসিয়ে বলে উঠল: 'এনজেলো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। চলে এসো!'

পেছন ফিরে বনভূমির দিকে তাকালুম। মনে মনে বললুম, 'যাব কি?' আগের মতোই আমার চেতনায় ভেতর সূক্ষ্ম তরঙ্গের মতো এক বোধ সঞ্চারিত হল। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, শুধু বুঝলুম, আমাকে যেতে হবে। তখন

হনহন করে সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলুম।

আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ মিটার পরে দেখি একটি গুহার মুখ। মুখের ওপর ঘন লতাপাতার ঝালর পর্দার মতো ঝুলছে। অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে নানা রঙের। সুগন্ধে মউ মউ করছে। এ জায়গাটা বেশ চওড়া। একটা ঝাঁকড়া গাছ যেন ভ্রূকুটি-কুটিল অজস্র চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। সাবধানে এগিয়ে ঝালরগুলো দুহাতে সরালুম। গুহার ভেতর ঘন অন্ধকার থমথম করছে। ভূতগ্রস্তের মতো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি এসেছি—আমি এনজেলো দস সান্তোস!'

পরক্ষণে চমকে উঠলুম। এ আমি কী বলছি? আমার মুখ দিয়ে কার হয়তো পুরো নাম বেরিয়ে গেল—যাকে আমি চিনি না। জানি না। তার সঙ্গে আমার যুগের ব্যবধানও বিরাট। অথচ এনজেলো দস সান্তোস নামে সম্ভবত কোনো পর্তুগিজ নাবিকের নাম আমি উচ্চারণ করে ফেলেছি। কিন্তু এও বুঝতে পারছি, যে এনজেলোকে ডেকে এখানে আনতে চাইছিল, সে ইংরেজ। কে সে?

এরপর আমার চেতনা যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একই শরীরে জয়ন্ত এবং এনজেলো। জয়ন্তর কিছু করার নেই। সে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে, এনজেলো কী করছে। ঠিক এভাবেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

হলফ করে বলতে পারি, ওই অন্ধকার গুহায় আমি কিছুতেই ঢুকতে পারতুম না। কিন্তু আমার আত্মায় এনজেলোর আত্মা ভর করেছে। আমি ঢুকে গেলুম ভেতরে। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। ওদিকে কোন ফাটল দিয়ে আলো আসছিল। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটো গাছের ডাল আড়াআড়ি বেঁধে ক্রস গড়া হয়েছে এবং সেটা পোঁতা আছে গুহার মেঝেতে। নিশ্চয় একটা কবর। কবরের ওপর আবছা আলো এসে পড়েছে সরু ফাটল থেকে। তাই এক টুকরো তক্তা নজরে পড়ছিল। সেটা কবরে ক্রসের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো আছে। তাতে খোদাই করা আছে বড় বড় আঁকাবাঁকা হরফে:

সেই অদ্ভুত মানুষটা নিষ্পলক তাকিয়ে আমাকে দেখছে

'ক্যাপ্টেন রোজারিও এনড্রুস স্মিথ'
মৃত্যু ১৬ জুন, ১৫৯১

ফলকটা তুলে ধরে পড়ছিলুম। সেই সময়, গুহায় যেদিক থেকে ঢুকেছি, তার উল্টোদিকে ফাটল থেকে আসা আলোয় এক ঝাঁক ব্যুমেরাং গড়নের সেই কাঠপোকাগুলোকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে দেখলুম। আমার পায়ের কাছ দিয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে গুহার দরজার দিকে চলে গেল। তারপর টের পেলুম ওদের পালিয়ে আসার কারণ। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

হনহন করে এগিয়ে আসছিল কেউ। ফাটলের আলোর কাছে সেও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ও কি মানুষ?

হ্যাঁ, মানুষই বটে। কারণ, আমার মতোই তার একটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা আছে। কিন্তু পরণে মাছের প্রকাণ্ড আঁশের মতো পাতার পোষাক যেন—পাতাবাহারের লাল-হলুদ চকরাবকরা রঙ ওই পাতাগুলোর। গলার কাছ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এই বিচিত্র পোশাক। দুটো বাহু এবং পা খালি। সবচেয়ে অদ্ভুত ওর গায়ের রঙ। খসখসে সবুজ।

মুখটাও সবুজ। ভুরু ও চোখের পাতা খয়েরি রঙের। চোখের তারা লালচে, বাকি অংশ ছাই রঙের। তার মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো অবিকল উদ্ভিদের গুচ্ছ মূল যেন,—চুলের রঙ মেটে।

সেই অদ্ভুত মানুষটা নিষ্পলক তাকিয়ে আমাকে দেখছে।

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গীতে একটু হাসলুম। তখন তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। সেও মাথাটা একটু দোলাল।

এবার আমি আমার জানা কয়েকটা ভাষায় তাকে জিগ্যেস করলুম, 'কে তুমি?' কিন্তু মনে হল, আমার কথা সে বুঝতে পারছে না। অথবা সে বোবা।

তারপর সে আমাকে হাতের ইশারায় তার সঙ্গে যেতে বলে যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিকে পা বাড়াল। মনে অস্বস্তি নিয়ে তাকে অনুসরণ করলুম। একটু এগিয়ে গুহার অন্য মুখে পৌঁছলুম। এ মুখটা বেশ বড়ো। দেখলুম, মুখের ওপর যে লতার ঝালর ছিল, তা দুপাশে সরিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। হয়তো এই সবুজ মানুষটাই এ কাজ করেছে। বাইরে বেরিয়ে জায়গাটা চিনতে পারলুম। কাল আমি ও প্রিয়বর্ধন এই পাহাড়ীখাতেই এসেছিলুম। অনেক নরকংকাল পড়ে আছে এখানে ওখানে। কিন্তু কালকের মতো কোনো চেঁচামেচি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল না। ভীষণ স্তব্ধ হয়ে আছে পরিবেশ। সবুজ মানুষ আমাকে ইশারা করল ডাইনে খুব সংকীর্ণ একটা খাতের ভেতর যেতে।

সেই খাতের ভেতর কিছুটা যাওয়ার পর এক অভাবিত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমাদের সামনে নিচে চওড়া অর্ধবৃত্তাকার একটা বেলা-ভূমি। সেখানে একদল এমনি রঙীন পাতার পোশাকপরা সবুজ মানুষ কী যেন করছে। তাদের হাতে গাছের ডাল। একটা প্রকাণ্ড পাতাশূন্য ডাল মাঝখানে পোঁতা আছে।

তারপরই চোখে পড়ল জলের ধারে চার পাঁচখানা ছিপ নৌকো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, এই সবুজ মানুষরা আসলে আমার মতোই মানুষই। তারা গায়ের রঙ মেখে চোখ-ভুরু এঁকে এই দ্বীপে এসেছে কোনো উৎসব বা পুজো আচ্চা করতে। এরা কোন দ্বীপের অধিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। ওই নৌকোয় চেপেই ওরা এসেছে।

এটা কিওটার উত্তর-পশ্চিম দিক। দূরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রবাল পাঁচিল। তাহলে এরা ঢুকল কোন পথে? পূর্বদিকের প্রবাল বলয়ের ভাঙা জায়গাটা ছাড়া এ দ্বীপে আসার পথ তো নেই।

আমার প্রশ্নের জবাব তখনই মিলে গেল। ঢোলের শব্দ

কাস্তের মত বাঁকানো চকচকে অস্ত্র

ভেসে এল এবং তারপর আতঙ্কে চেয়ে দেখলুম; ডানদিকের পাহাড়ে সেই ঝর্ণার পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে আরও একদল সবুজ রঙ মাখা মানুষ কাকে বেঁধে কাঁধে বয়ে আনছে। বিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলুম বেচারা প্রিয়বর্ধনকে।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমার সঙ্গী সেটা আঁচ করেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। কিন্তু উৎকট দুর্গন্ধেই কাবু হয়ে গেলুম। ওর গায়ের দুর্গন্ধটা নিশ্চয় রঙের কড়া ঝাঁঝ। সে আমাকে মাটিতে পেড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। অমনি নিচের বিচ থেকে কয়েকজন ছুটে এল। অসহায় হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিলুম।

প্রিয়বর্ধন চোখ বুজে পড়েছিল পোঁতা ডালটার সামনে। লতা দিয়ে তাকে আষ্টেপিষ্টে ততক্ষণে বেঁধে ফেলেছে এরা। সে চোখ খুলে আমাকেও একই দশায় দেখে ভীষণ বিপদের মধ্যে করুণ হাসল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'অন্যদিকে ঘুরে বোট সারাচ্ছি, ব্যাটাচ্ছেলেরা কখন পেছন থেকে এসে…'

একটা লোকের মাথায় ফুলের মুকুট। তার হাতে একটা চওড়া কাস্তের মতো বাঁকানো চকচকে অস্ত্র। সে হুমহাম করে গর্জন করে অস্ত্রটা নাড়তেই প্রিয়বর্ধন চুপ করে গেল।

বালির ওপর অসংখ্য ফুল ছড়ানো আছে। সবুজ রঙ মাখা লোকগুলো বিকট নাচতে লাগল তার ওপর। ঢোল বাজছিল। সেটা দ্বিগুণ জোরে বাজতে লাগল। তারপর ওরা দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে শুরু করল।

মাথার ওপর সূর্য। বালি তেতে উঠছিল ক্রমশ। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল — লতা দিয়ে এমন শক্ত করে আমাদের বেঁধেছে যে রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

তাদের নাচগানবাজনা ক্রমশ চরমে পেঁছিল। মাঝেমাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলুম। এইভাবে কতক্ষণ কাটল জানি না, একসময় দেখি, ওরা আমাকে আর প্রিয়বর্ধনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ঠাহর করে বুঝলুম, সেই পাহাড়ী খাতের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সেই গুহার প্রকাণ্ড মুখের সামনে ওরা আমাদের নামিয়ে দিল। তারপর দুজনকেই উপুড় করে শোওয়াল। বেশ বুঝলুম, এবার আমাদের মাথাটা কাটা হবে। আমরা কিওটা দ্বীপের বৃক্ষদেবতার বলি হব। ভাবলুম, প্রিয়বর্ধনকে মৃত্যুর মুহূর্তে শেষ বিদায় জানাই। কিন্তু কথা বেরুল না। তালু শুকিয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিটুকুও আর নেই। তখন চিন্তা করলুম, ওই কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা দিয়ে নিশ্চয় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলাটা কাটবে ওরা, যন্ত্রণাটা কতখানি হতে পারে।

এখন কিন্তু ঢাক বাজছেনা। কেউ কথা বলছে না। আড়চোখে যতটা দেখা যায়, লোকগুলোর হাবভাবে চঞ্চলতা আঁচ করা যাচ্ছিল। একজন আমার এবং আরেকজন প্রিয়বর্ধনের পাশে বসে পড়ল।

হঠাৎ আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের গতিতে একটা বোধ দিল। এ দ্বীপের কৃষকবন্ধুদের এবিপদে ডাকছিনা কেন? সেই মুহূর্তে তখনকার মতোই আমার আচ্ছন্ন চেতনা থেকেই যেন সাড়া এল। অনেক কষ্টে ফিনফিন করে বলে উঠলুম, 'আমি দম সন্তোস! আমাকে বাঁচাও!'

অমনি গুহার দিক থেকে ঝড়বাতাসের শব্দের মতো শব্দে উচ্চারিত হল : 'এনজেলো! এনজেলো! এনজেলো!

আমাদের পাশে বসে থাকা লোকদুটো তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। 'এনজেলো' শব্দটা করছিল ক্রমশ বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল ঝড় বইতে শুরু করেছে 'এনজেলো' শব্দের।

তারপর শোনা গেল সেই প্রতিধ্বনি : 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট! উচুঁ পাহাড়ের দেওয়ালে সেই ভীষণ চিৎকার বিকট প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলল। 'আই কিল ইউ। কিল…কিল কিল!' তারপর 'হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

দড়বড় দড়বড় শব্দ করে সবুজরঙমাথা পাতার পোশাক-পরা আদিম লোকগুলো ততক্ষণে উধাও। চেঁচামেচি থামলে মুখ অতিকষ্টে ঘুরিয়ে দেখি, জনপ্রাণীটি নেই। আর সামান্য তফাতে সে কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা পড়ে আছে। বুঝলুম, দেবতা বলি খেতে চায়নি বলে কিংবা ঘাতকের চোটে ব্যাটাচ্ছেলেরা অস্ত্রটা ফেলেই পালিয়ে গেছে। আমার গলায় এতক্ষণে জোর ফিরে এল। শরীরেও।

কিন্তু প্রিয়বর্ধনকে ডেকে সাড়া পেলুম না। গড়াতে গড়াতে অস্ত্রটার কাছে গেলাম। তারপর ওটার বাঁট কামড়ে চিত করে দুটো পাথরে মাঝখানে বসালুম। ঠোঁট কেটে গেল একটু। এবার কাত হয়ে অস্ত্রটার ডগায় হাতের বাঁধনটা ঘষতে থাকলুম। বাঁধন কেটে গেল। এবার আর অসুবিধে হল না।

একটু পরে প্রিয়বর্ধনের বাঁধন কেটে তাকে চিত করে দিলুম। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি?'

'বেঁচে আছো। ওঠ।'

প্রিয়বর্ধন তবু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'আমার ধড়টা কোথায়?

যথাস্থানে আছে। উঠে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।'

ওকে টেনে ওঠালুম। ও কিছুক্ষণ হাত পা ছোড়াছুড়ি করে এবং লাফালাফি করে রক্ত চলাচল ঠিক করে নিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি তো জয়ন্ত। কেন বলছিলে আই এ্যাম এনজেলো দস সন্তোস? এনজেলো শুনেছি কাপ্তেন রোজারিওর ছেলের নাম ছিল। ওর বউ ছিল পর্তুগীজ।'

বললুম, 'ওসব পরে শুনব। এখন চলো, খিদে পেয়েছে।' (ক্রমশঃ)

সর্পগন্ধা

সন্দীপ সেন

বনৌষধি হিসেবে সর্পগন্ধা একটি অন্যতম উদ্ভিদ। ভারতবর্ষে ভেষজ ঔষধ হিসেবে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকেই সর্পগন্ধার ব্যবহারের উল্লেখ বিভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রে (আয়ুর্বেদ) দেখা যায়।

সর্পগন্ধার বৈজ্ঞানিক নাম রাউলফিলা সারপেনটিনা (Rawolfila serpentina)। এই গাছ সাধারণত ছায়াযুক্ত ভেজা স্থানে ভাল জন্মায়। দোআঁশ কিম্বা কাদা মাটিতে সর্পগন্ধার চাষ ভাল হয়। সপুষ্পক গুল্মজাতীয় এই উদ্ভিদটির কান্ডে শাখা-প্রশাখা। পাতাগুলির উপরের দিক বেশ চকচকে ও মসৃণ কিন্তু নীচের দিক খসখসে। ফুলগুলি সাদা রং-এর। মূলটি স্থূল, শক্ত ও প্যাঁচালো হয়। ভারতবর্ষের সমতল বা পার্বত্য অঞ্চলে এই গাছের চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং ভারতবর্ষের আন্দামান, দেরাদুন, সিকিম, খাসিয়া পাহাড় ইত্যাদি জায়গায় গাছটি বুনোগাছ হিসেবে পরিচিত।

সর্পগন্ধা গাছটির বিভিন্ন অংশ নানাভাবে ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই গাছের বিভিন্ন প্রজাতি থেকে প্রায় চল্লিশ রকমের উপকার পাওয়া যায় যাদের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শীতকালে সর্পগন্ধা গাছগুলিকে কেটে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর গাছের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা ভাবে গুঁড়িয়ে নানারকম পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরী করা হয়। শিকড়ের ছাল এবং শিকড় থেকে যথাক্রমে রাউলফিন্ ও রেসারপিন নামক উপক্ষার পাওয়া যায়। এই দুইটি উপক্ষারই রক্তচাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম। তাই এগুলি থেকে রক্তচাপ বৃদ্ধি নিবারক ঔষধ যেমন রেসারপিন ব্যবহৃত হয়। মূল থেকে প্রাপ্ত এজমালিন হাঁপানীর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কান্ড থেকে প্রাপ্ত সার্পেন্টিনাইন এবং মূলের নির্যাস মানসিক রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারপেনটিন স্নায়বিক দৌর্বল্যের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতার রস চোখের কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্পগন্ধা গাছের টনিক ক্রিমিনাশে ব্যবহার করা হয়। জাপান এবং জার্মানিতে সর্পগন্ধা টনিক ক্রিমিনাশক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়।

শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনেও সর্পগন্ধা গাছ দেখা যায়।

মেরুজ্যোতি ও তার উৎস

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

উভয় মেরুর আকাশে যে মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণ সমাহার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় মেরুজ্যোতিকে—তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ মুগ্ধ-বিস্মিত-চিন্তিত। আকাশের গায়ে ঐ অত্যুজ্জ্বল আলোকের সাথে কেমন করেই বা ঐ বর্ণ বাহারের সৃষ্টি হয়—তার উৎসই বা কি? শুধু বাহারই নয়। দেখা গেছে মেরুঃজ্যোতি পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে তড়িৎ শক্তির সঞ্চার করে তা পৃথিবীর সকল দেশের উৎপাদিত মোট বিদ্যুৎশক্তির প্রায় সমান। এই অতিরিক্ত শক্তি প্রায়ই বেতার এবং রাডার তরঙ্গকে ব্যাহত করে, মাইক্রোওয়েভ লাইনের সার্কিটকে হয় সম্পূর্ণ না হয় আংশিকভাবে বিপর্যস্ত করে। এমন কি দেখা গেছে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের 'সার্কিট ব্রেকার' গুলোর ওপর আবেশ ঘটিয়ে কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে বিশাল এলাকাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।

এই সুন্দর অথচ বিপজ্জনক প্রাকৃতিক আলোকের উৎস কি? এ সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করলেন নরওয়ের পদার্থবিদ ক্রিস্টিয়ান বার্কল্যান্ড 1896 খ্রিস্টাব্দে। তিনি বললেন, 9 কোটি দূরের সূর্য থেকে নিরন্তরভাবে যে মহাজাগতিক কণাসমূহ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা পৃথিবীর ওপরে 50,000 থেকে 80,000 কিমি. মধ্যে যে রক্ষাকারী এক চৌম্বকীয় সেকলের আচ্ছাদন রয়েছে—তাতে প্রতিহত হয়। তখন তারা পাথরের গা বেয়ে প্রবাহিত জল স্রোতের মত ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের গা বেয়ে প্রবাহিত হয়ে ফাঁক খোঁজে—কোন ছিদ্র পথে পৃথিবীর বুকে ধেয়ে আসবে। ফাঁক তারা পায়—মেরু প্রদেশে। আর ঐখান দিয়েই তারা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে। ঐ কণাসমূহ এমন এক তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে যে পৃথিবীর 5000 হাজার কিমি. ওপরকার আবহমণ্ডল সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তৈরি হয় এক বিশাল তড়িৎক্ষেত্রের। আর ঐ তড়িৎক্ষেত্র ঐ কণাসমূহ, আয়ন, আর ইলেকট্রনগুলো উত্তেজিত করে তোলে। ঐ শক্তি যখন 100 কিমি. উঁচুতে আবহমণ্ডলের অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের অণু পরমাণুর সংস্পর্শে আসে—তখনই ঘটে কিছু বিচিত্র ব্যাপার।

অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের অণুগুলো ঐ কণাসমূহ দ্বারা পরিবাহিত কিছু শক্তি শোষণ করে নিয়েই অতিরিক্ত শক্তি আলোর আকারে নির্গত করে দেয়। অক্সিজেন সৃষ্টি করে সবুজ আর লাল আলোর আর নাইট্রোজেন জন্ম দেয় বেগুনী, নীল আর ঘন নীলের। আকাশের গায়ে তখন উজ্জ্বল রঙের খেলা চলে।

যখন সৌর ঝড়ের ফলে নিক্ষিপ্ত কণাসমূহ আরও বেশী পরিমাণে মেরু প্রদেশের চৌম্বকক্ষেত্র ভেদ করে ঢুকে পড়ে তখন ঐ আলো জনঅধ্যুসিত অঞ্চলেও দেখা যায়। যেমন উত্তরে দক্ষিণ কানাডায়, উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে, জার্মানি, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষিণ এথেন্স, মেক্সিকো উপসাগরেও দেখা যায়। দক্ষিণ মেরুর আলো সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এবং নিরক্ষ অঞ্চলেও দেখা গেছে। এ সব অঞ্চলে মেরুজ্যোতিকে মনে হয় যেন মেঘের গায়ে প্রতিফলিত কোন শহরের আলোর দ্যুতি। অনেকক্ষেত্রে দূরের কোন শহরে আগুন লেগেছে মনে করে লোকে দমকলকেও খবর দিয়েছে। নরওয়ে এবং অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোয় মেরুঃজ্যোতিকে মনে হয় আকাশের গায়ে বিস্তীর্ণ এক পর্দা, বা কখনও রামধনুর আকৃতির মত বক্র।

সৌরঝড় প্রতি এগার বছর অন্তর বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় উভয় মেরু অঞ্চলে মেরুজ্যোতিও উজ্জ্বলতর হয়। যেমন 1979-80 সালে হয়েছিল।

তবু মেরুজ্যোতি নিয়ে এখনও নিরন্তর গবেষণা চলেছে। হয়ত আগামীকাল আমাদের উপহার দেবে নতুন কিছু তথ্য। বৈজ্ঞানিকদের চক্ষে মেরুজ্যোতি যাই হোক না কেন—সাধারণ মানুষের চক্ষে তা যুগ যুগ ধরে এক নিরুপম সৌন্দর্যের ছবি হিসাবেই প্রতিভাত হয়ে এসেছে এবং আসবে।

পদার্থের অবস্থা ধর্মপরিবর্তন ও শ্রেণীবিভাগ

অমরনাথ রায়

অগণিত বিচিত্র পদার্থ দিয়ে গড়া আমাদের এই জড় জগৎ। জড় জগতের পদার্থগুলি কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় —এই তিন ভৌত অবস্থায় থাকতে পারে। প্রত্যেক পদার্থের আবার দুটি করে ধর্ম আছে— ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম। এই দুই ধর্মের দ্বারা আমরা যে কোনও পদার্থকে সনাক্ত করতে পারি। ধর্মের মত পদার্থের পরিবর্তনও দু'রকম—ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন। রাসায়নিক পরিবর্তন আবার দু'রকম—তাপগ্রাহী ও তাপমোচী। বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাবার বা প্রভাবিত করার উপায়ও আলাদা। আমাদের জানা-অজানা অসংখ্য পদার্থকে রসায়ন বিজ্ঞানীরা মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র— এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মৌলিক পদার্থগুলিকে আবার ভাগ করা হয়েছে দু' ভাগে। এক ভাগকে বলা হয় ধাতু; আর এক ভাগকে বলা হয় অধাতু। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতেই ধাতু ও অধাতুর শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। ভূমিকা এইখানেই শেষ করে, এসো আমরা এই নব বিষয়ের যতটুকু জেনেছি বা শিখেছি, তা যাচাই করে নেওয়া যাক।

(1) কঠিন পদার্থ লোহাকে কি তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত করা যায় ?

উত্তর : হ্যাঁ, লোহাকে উপযুক্ত উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে প্রথমে তা গলে তরলে পরিণত হয়। উষ্ণতা আরও বাড়ালে তরল লোহা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

(2) শিলাবৃষ্টির 'শিলা' কি জিনিস ?

উত্তর : শিলাবৃষ্টির 'শিলা' পাথর নয়— বরফ। মেঘের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে, প্রথমে জল, এবং পরে তাপ নিষ্কাশনের ফলে 0°C উষ্ণতায় আরও ঘনীভূত হ'য়ে কঠিন বরফে পরিণত হয়। বৃষ্টির সঙ্গে বরফের টুকরোগুলি যখন মাটিতে ঝরে পড়ে তখন আমরা বলি শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

(3) 'আয়োডিন' কঠিন পদার্থ। একে উত্তপ্ত করলে কি ধরনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে ? কেন ঘটবে ?

উত্তর : কঠিন আয়োডিন তাপের প্রভাবে তরল না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রথমে তরল ও পরে বাষ্পে পরিণত হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে। এই ধরনের অবস্থার পরিবর্তনকে বলা হয় ঊর্ধপাতন। ঊর্ধপাতনের ক্ষেত্রে বাষ্পকে শীতল করলে সেই বাষ্প তরলে পরিণত না হয়ে আবার সরাসরি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়।

(4) সাধারণত কোনও বিশুদ্ধ পদার্থের হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক একই হয়। এর ব্যাতিক্রম দেখা যায় কোন্ কোন্ পদার্থের ক্ষেত্রে ?

উত্তর : মোম, চর্বি মাখন, কাচ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। এই সব পদার্থের নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক নেই। গলে যাবার বা জমে যাবার আগে এরা এক রকম থকথকে অবস্থায় পরিণত হয়। এদের প্রত্যেকের হিমাংক ও গলনাঙ্ক এক নয়— আলাদা।

(5) জলের সাহায্যে কি ভাবে তুঁতেকে সনাক্ত করা যায় ?

উত্তর : তুঁতে নীল রঙের দানাদার পদার্থ। একে উত্তপ্ত করলে এটি সাদা রঙের অনিয়তাকার গুঁড়োয় পরিণত হয়। ঐ গুঁড়োয় জল থাকে না বলে ওকে অনার্দ্র তুঁতে বা অনার্দ্র কপার সালফেট বলে। তাপের প্রভাবে তুঁতের কেলাস থেকে জল বেরিয়ে যায় বলেই তুঁতে তার কেলাস জল হারিয়ে এবং নীল রঙ হারিয়ে সাদা গুঁড়োয় পরিণত হয়। ঐ সাদা গুঁড়োয় কয়েক ফোটা জল ফেললে, সাদা গুঁড়োটি অমনি আবার নীল রঙের সোদক কপার সালফেটে পরিণত হবে। জলের এই রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে তুঁতেকে এমনিভাবে সনাক্ত করা যায়।

(6) 'গন্ধ' পদার্থের এক ভৌত ধর্ম। এই ধর্মের সাহায্যে সনাক্ত করা যায় নিচের কোন্গুলিকে এবং কি ভাবে ?

(ক) জল (খ) অ্যামোনিয়া (গ) অ্যালুমিনিয়াম (ঘ) হাইড্রোজেন সালফাইড।

উত্তর : গন্ধের দ্বারা সনাক্ত করা যায় অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইডকে। অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিশিষ্ট

ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। আর হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসে আছে পচা ডিমের গন্ধ। এই দুই গ্যাসের ঐ দুই বিশিষ্ট গন্ধ শুঁকেই গ্যাস দুটিকে সনাক্ত করা যায়।

(7) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল ফেললে, সাদা চিনি কালো হ'য়ে যায় কেন ?

উত্তর : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড একটি তীব্র জলাকর্ষী পদার্থ। চিনি হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড চিনির মধ্যেকার জলের উপাদানের সবটুকুকে শুষে নেয়। তখন পড়ে থাকে কেবল কার্বন। 'কার্বন' হলো কালো রঙের মৌল। তাই সাদা চিনি তখন কালো হয়ে যায়— কার্বনের উপস্থিতির জন্যে।

(8) চুনাপাথরকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে কি ঘটবে ? বিক্রিয়াটিকে কি নামে অভিহিত করবে ?

উত্তর : তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে চুনাপাথর বিযোজিত হ'য়ে চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করবে। এই ধরনের বিক্রিয়ার নাম 'তাপীয় বিযোজন'।

(9) একটি পরীক্ষা নলে জল দিয়ে তাতে কিছু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত করলে তাপীয় পরিবর্তন হবে কি ? কি রকমের পরিবর্তন ঘটবে এবং তার নাম কি ?

উত্তর : জলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হলে দ্রবণটি ঠান্ডা হবে। এটি তাপগ্রাহী (endothermic) বিক্রিয়া।

(10) একখণ্ড সোডিয়ামকে জলে ফেলা হলো। কি ঘটতে দেখা যাবে এবং বিক্রিয়ার ফলে কোন্ কোন্ পদার্থ উৎপন্ন হবে ?

উত্তর : জলে একখণ্ড সোডিয়ামকে ফেললে সেটি বিস্ফোরণ সহ জ্বলে উঠবে এবং বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হবে হাইড্রোজেন গ্যাস ও সোডিয়াম হাইড্রাইড নামক যৌগ।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম

বিষয় : প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী

প্রথম স্থানাধিকারী— মতিউর রহমান— দশম শ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম—রামপুর হাট উচ্চ বিদ্যালয়

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী— অভিজিৎ সরকার—দশম শ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম—কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর।

তৃতীয় স্থানাধিকারী—কাকলী মজুমদার— নবম শ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম—বেহালা শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠ।

★ ★ ★

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম

বিষয় : বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার

প্রথম স্থানাধিকারী—চন্দ্রমৌলি মুখার্জী— ষষ্ঠশ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম— রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জুনিয়ার হাইস্কুল, 24-পরগনা।

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী—সীমা বসু—সপ্তম শ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম—শুঁড়াকন্যা বিদ্যালয়, কলকাতা।

তৃতীয় স্থানাধিকারী— মৃণালকান্তি মান্না—সপ্তম শ্রেণী।
বিদ্যালয়ের নাম—ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দির, হুগলী।

পুরস্কৃত রচনাগুলি মাসিক কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। সফল প্রতিযোগীদের ডাকযোগে সম্মান-মূল্য ও মানপত্র পাঠানো হচ্ছে।

রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক
সমরজিৎ কর । অমরনাথ রায়

বঙ্কুবাবুর গল্প

বিমলেন্দু মিত্র

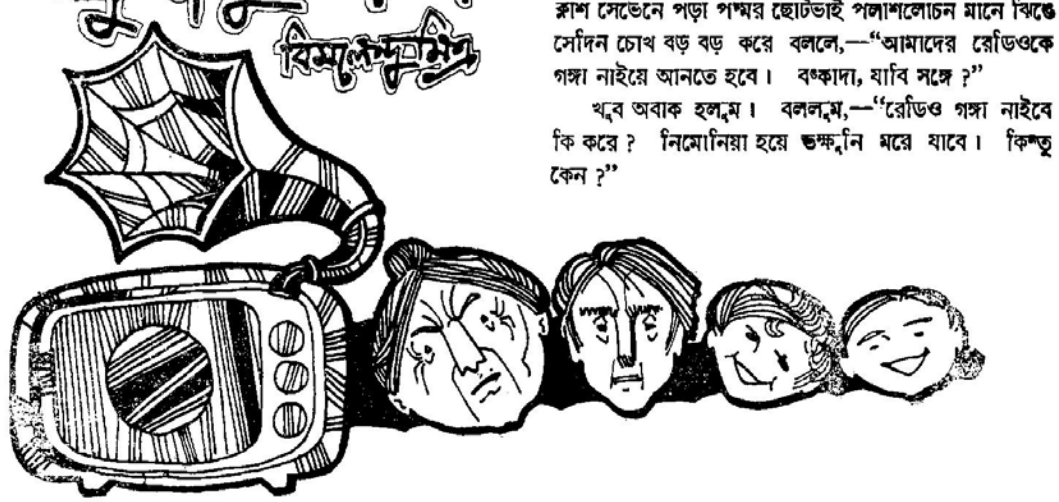

রেডিওকে মর্ত্যের জিনিস বলে ভাববার কারণ পাইনি আমরা।

ক্লাশ সেভেনে পড়া পদ্মর ছোটভাই পলাশলোচন মানে ঝিঙে সেদিন চোখ বড় বড় করে বললে,—"আমাদের রেডিওকে গঙ্গা নাইয়ে আনতে হবে। বঙ্কাদা, যাবি সঙ্গে?"

খুব অবাক হলুম। বললুম,—"রেডিও গঙ্গা নাইবে কি করে? নিমোনিয়া হয়ে তক্ষুনি মরে যাবে। কিন্তু কেন?"

ইনস্যাট আর টেলিভিশন দিয়ে কথা শুরু হয়ে ভ্যালভ, ট্রানজিস্টরে এই সবে পেঁছিছিলুম। তপেশ বললে,—"আজকাল হল আই, সির যুগ। ট্রানজিস্টর উঠে গেছে, আছে সিলিকন চিপস। রেডিওতেও আই, সি, চলছে।" বঙ্কুবাবু বললেন,—"রেডিও বিনা-চিপস-এই শোনা যায়; এমন কি ভ্যালব ট্রানজিস্টর কিছুই লাগে না। ইলেকট্রনিকসএরই যে দরকার আছে আমার কাছে তা বোলো না,—যে আমি সাতচল্লিশ বছর আগে পদ্মর ঠাকুমার ঠাকুরঘরের গভীর রহস্যের সমাধান নিজের চোখে দেখেছে। যা বুড়ি, তোর জ্যেঠিমার কাছ থেকে আরও দুটো মোচার চপ নিয়ে আয়। জিনিসটা খাসা হয়েছে!"

তপেশ বললে,—"আবার ঠাকুরঘর নিয়ে টান মারছ কেন? বলবে তো চাড্ডি মিছে কথা।"

বঙ্কুবাবু বললেন,—"মিছে কথা আমি কখনো বলিনা। যা বলি তা হল জীবনের কষ্ঠিপাথরে ঘসা সত্যি অভিজ্ঞতার গল্প। হ্যাঁ, সাতচল্লিশ বছর আগের কথা। তখন আমরা ক্লাশ এইটে। এ দেশে টেলিভিশন তো ভবিষ্যতের গর্ভে বটেই এমন কি হুদো হুদো রেডিওসেটও আমদানি হয়নি।

দু একটা বড়লোকের বাড়িতে গোবদা বাক্সের ওপরে সেকেলে গ্রামাফোনের চোঙার মত প্রশ্নচিহ্নের আকারের লাউডস্পীকার বসানো জগদ্দল রেডিও সবে এসেছে!

পদ্মলোচনের বাড়ি অমনি হাঁড়িমার্কা রেডিও ছিল। আমরা ফি বেস্পতিবার রাত্তির অনেকটা পর্যন্ত থিয়েটার শুনতুম। রেডিও তখন এক স্বর্গীয় বস্তু। এমন কি যখন সে এক পয়লা এপ্রিলে চার্লি চ্যাপলিনের গান শোনাবে বলে সটান সবাইকে এপ্রিল ফুল করে দিলে, তখনও

ঝিঙে বললে,—"ঠাকুমা বলেছে। রেডিওতে কি সব দিষ্টি পড়েছে। হ্যাঁ বঙ্কাদা, সেদিন রেডিও পঙ্কজের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ বাবাকে গালাগাল দিয়েছে।"

পদ্মকে চেপে ধরে ব্যাপারটা শোনা গেল। সেদিনও বেস্পতিবার। রেডিও খুলে সবে পদ্মর বাবা বসেছেন। পঙ্কজের নতুন গান রেডিওর চোঙা দিয়ে মধুস্রোতের মত গড়িয়ে পড়ছে। গানের মধ্যেই গলা খাঁকারি দিয়ে রেডিওর চোঙা চেঁচিয়ে উঠল—"ওরে অলপ্পেয়ে হারান, তোর মজা বার করব—" তারপর আবার যে গানে সেই গানে, যেন কিছুই হয়নি। হ্যাঁ গলাটা একটু খোনা খোনা। হারান হল পদ্মর বাবার নাম। কিন্তু রেডিও স্টেশন তো তাঁকে চেনে না। প্রোগ্রামের ভেতরে গান থামিয়ে তাঁকে গালাগালি দেবার প্রশ্নও ওঠেনা।

পদ্মর বাবা ধমক খেয়ে বেজায় রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। সামলাবার আগেই আবার সবাই শুনতে পেল, রেডিও বলছে,—"অলপ্পেয়ে গদাইকে বিল জমা দিসনি বলছি!"

কথাগুলো গভীর অর্থবহ। পদ্মদের খানদানী মাছের ব্যবসা। কোলকাতার পুবে ওদের অনেকগুলো ভেড়ি ছিল। গদাই নস্করকে একটা ভেড়ি জমা দেবার ব্যাপারে গোলমাল চলছে। পদ্মর ঠাকুমা দারুণ আপত্তি করছেন। তিনিই সম্পত্তির আসল মালিক। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিও পদ্মর ঠাকুমার মনের কথা ব্রডকাস্ট করবে কেন?

মনে করে দেখ, আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগের কথা। টেপরেকর্ডার, ভিডিও ফিডিও তখন স্বপ্নেও নেই। রেডিওর চোঙার মধ্যে দিয়ে গারস্টিন প্লেস ছাড়া অন্যকিছু

ভেসে আসার দূরতম সম্ভাবনাও ছিল না।

পদ্মর ঠাকুমাকে তোরা দেখিসনি। মোটা, ফর্সা, ছোট খাট বুড়িমানুষ, ধবধবে সাদা থানপরা; মাথা কামানো, মাথার পেছনে পুরুষদের মত লম্বা টিকি, নাকে কপালে কণ্ঠায় রাধাকৃষ্ণ ছাপ গলায় কণ্ঠি, হাতে থলি, চোখে ধমকানো চাউনি, মুখে প্রায়ই গালাগালি। পদ্ম মানে ফিঙে আর পলাশ অর্থাৎ ঝিঙে; এই দুই নাতি ছাড়া বাড়ির সবাই যমের মত ভয় করে। এই ঘটনা যখন ঘটছিল, ঠাকুমা তখন চিলেকোঠার ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যারতি করছেন।

বীরু কথাটা ক্লাশময় রটিয়ে দিলে। পদ্মদের বাড়ি ভূতে বাসা করেছে; ভূত রেডিওর মধ্যে দিয়ে খোনা খোনা গলায় গালাগালি দিচ্ছে।

ভূপেশবাবু স্যারকে যখন জানানো হল যে পদ্মর বাবার ভূতুড়ে রেডিও থেকে ভূত ছাড়াবার জন্য তাকে গঙ্গা নাইয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে; স্যার খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গোঁফ চিবিয়ে বললেন,—"যতদূর মনে হয় গঙ্গা নাইয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না। তার জন্যে রোজা, ঝাঁটা, হলুদপোড়া এইসব লাগে। অবশ্য কোনটাই সায়েন্টিফিক নয়।" ভূত তাড়াবার সায়েন্টিফিক উপায় কি তা জিজ্ঞাসা করার আগেই স্যার বললেন;—"পদ্মলোচন, তোমার বাবাকে বোলো; সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের বাড়িতে যাব।"

আমি বীরু স্যারের সঙ্গেই ঝিঙেদের বাড়ি হাজির হলুম। রেডিও দোতলার হলঘরে। স্যার নিবিষ্টমনে রেডিওটা দেখলেন। কালো রঙের চোঙটা নিরীহ প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে। জগদ্দল বাক্সোর গায়ে গোটা দুই নবু; পেছন দিকে দুটো তার বাইরে চলে গেছে, একটা এরিয়েল একটা আর্থ। প্লাগ লাগিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই রেডিও গেয়ে উঠল;—"বাঁধনা তরীখানি, আমার এই নদীকূলে!

কিন্তু কোন গোলমাল নেই, নদীকূলে তীরবাঁধার প্রার্থনা পূর্ণ হল কিনা বোঝা গেল না,—হঠাৎ তীক্ষ্ণ অপার্থিব তারস্বরে রেডিওতে বেজে উঠল,—অ'লপেয়ে হারানের বৌ ভেবেছে কি' ? স'ব দূর ক'রে দোব—বাঁধনা তরীখানি —শেষটুকু ফের স্বাভাবিক সুরেলা গান।

পদ্মর বাবাও ভূপেশবাবু স্যারের ছাত্র ছিলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন—"একি হল স্যার ?"

স্যার গোঁফ চিবিয়ে নিয়ে প্যাঁচাচশমার ভেতর দিয়ে চেয়ে বললেন,—"ভালো করে ইনভেস্টিগেশান করা দরকার হারান। এক্ষুনি বোসেদের বাড়ি যেতে হবে ওদেরও রেডিও আছে।"

বোসেদের বাড়ি হাজির হতেই জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দেখা। স্যার বললেন, "জ্ঞানবাবু, মিনিট পনেরো আগে কি রেডিও খোলা ছিল ?"

জ্ঞানবাবু বললেন,—"খোলা ছিল বই কি। মিস আঙুর বালার গান তো মিস্ করবার নয়!"

—'গানের মাঝখানে কি অন্য আজে বাজে কথা শুনেছেন ?" ও'রা দস্তুর মত অবাক হলেন।—"কেন, কেন, মাষ্টারমশাই ?" অন্য কথা কেন শুনবো ? গানখানাই দারুণ দানা বেঁধেছিল।"

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে স্যার গম্ভীর গলায় বললেন, —"চল পদ্ম, তোদের বাড়িতেই রহস্য দানা বেঁধেছে। গারষ্টিন প্লেস নিরপরাধ। ভাল করে ইনভেষ্টিগেশান করতে হবে।"

ওদের বাড়ি পেঁছতেই ঝিঙের ঠাকুমার সামনে পড়লুম। উত্তেজনায় কম্পিতদেহে জপের মালা উঁচিয়ে তিনি ভূপেশ-বাবু স্যারকেই তেড়ে এলেন।—"ম্যাষ্টার, তুমিও এই অলপ্পেয়ে হ্যাড়হাবাতে গুষ্ঠির কথায় উঠছ বসছ ? আমার চারশো টাকা দামের রেডিওতে ভূতে কথা কইছে। শোধন করবার জন্যে মা গঙ্গায় ডুবিয়ে আনতে বললুম। তা তুমি নাকি বারণ করেছ ?"

স্যার বললেন,—"পিসীমা, রেডিওভূত কি গঙ্গার জলে ভয় পায় ? গঙ্গায় নিয়ে গেলে হয়তো রেডিওটাকেই হাওয়া করে দেবে। তার চেয়ে আমায় একটু ভেবে নিতে দিন।" স্যার সমেত আমরা ঠায় বসে রইলুম।

সাড়ে সাতটার খবর হল; ইংরিজি বাজনা টাজনা হল, ভাল ভাল বক্তৃতা হল,—নাঃ, কোথাও কোনও গোলমাল নেই। পদ্মর ঠাকুমা রেগে বললেন,—"অলপ্পেয়েরা আমার কোনদিন ভূতের গলা শোনাতে পারলে না। আমি পুজোয় বসলেই নাকি ভূত নামে রেডিওতে। তোরা কি বলতে চাস অলপ্পেয়েরা যে আমিই ঘণ্টা নেড়ে ভূত নামাই ?" স্যার যেন একটু চমকে উঠলেন। বললেন,—"সে কি পিসীমা, আপনি নিজে শোনেন নি ?"

পদ্মর ঠাকুমা এবার ফিক করে হাসলেন! বললেন; —'আমাকে দেখে ভূত পালায়। না বাছা, ঐ ভূত ড্যাকরা আসে ঠিক যক্ষুনি আমি সন্ধ্যে দিতে ছাতে উঠি, তক্ষুণি। ঐ অলপ্পেয়ে ভূতের জ্বালায় কি আমি সন্ধ্যের আরতি করব না ?" স্যার খুব ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। আমরা পরের দিনের সন্ধ্যার অপেক্ষায় ছটফট করতে লাগলুম।

পদ্মের বাড়ি গিয়ে শুনলাম, ভূতেরা আর কিছু বলে কিনা শোনবার জন্যে পদ্মর বাবা নাকি সারারাত্তির রেডিও চালিয়ে রেখেছিলেন। রেডিও কোনও কথা বলেনি।

স্যার আসতে পদ্মর ঠাকুমা বললেন,—"কি ম্যাষ্টার; একটা বিহিত করবে কিছু ? অলপ্পেয়ে ভূতের দৌরাত্মিতে কি রেডিও শুনতে পাবে না কেউ।

স্যার বললেন,—"আপনি পুজোয় বসুনগে পিসীমা। আমি হারানের সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই।"

রেডিও চালিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। ঠাকুমা ছাতে চলে গেছেন। রেডিওতে বাজার দর বলছিল। ঝিঙের দরের মধ্যেই আবার সেই কামান গর্জন,—"অ'ল-পেয়ে ম্যাস্টরটা ভে'বেছে কি? আজকের বাজারে আলুর পাইকারী দর হল—" ইত্যাদি। নাঃ, কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রোগ্রামের মধ্যেই পদ্মর ঠাকুমার মনের কথাগুলো সোচ্চার হয়ে রেডিও মারফৎ ছড়িয়ে পড়ছে। ঠাকুমার ঠাকুরঘর কোনও কারণে গারন্টিন প্রেস হয়ে যাচ্ছে। হারানবাবু মাথাটাথা চুলকে চললেন, —সারাদিন সারারাত রেডিও খুলে রেখেছিলুম। শুধু মা সন্ধ্যেবেলা পুজোয় বসলেই এই ব্যাপার ঘটছে।"

স্যার ভাবতে ভাবতেই বললেন,—"ওটা পিসীমার গলা বলেই মনে হচ্ছে কি?"

উনি বললেন,—"গলা ঠিক চেনা যাচ্ছে না, তবে ঐ অলপেয়ে, ড্যাকরা, এইসব গলাগালিগুলো থেকেই মনে হয় —স্যার বললেন,—বুঝেছি। আচ্ছা, আমি ছাতের পুজোর ঘরে যাচ্ছি। তোমরা এইখানে বোসো। যদি পিসীমার গলা পাও আমায় ওপরে গিয়ে জানিও।"

আমি স্যারের সঙ্গে ছাতে উঠলুম। শ্বেতপাথরের ঠাকুরঘর। বিগ্রহ টিগ্রহ নিয়ে এলাহী ব্যাপার। আসন পেতে বসে, ফলমূল সাজিয়ে ঠাকুমা পুজো করছেন। তারপর আরতি। ছোট্ট একটা রুপোর ঘণ্টা নেড়ে ঠাকুমা আরতি শুরু করলেন,—আর আধমিনিটের মাথায় ঝিঙে ফিঙে ছুটতে ছুটতে এসে বললে,—"শোনা গেছে, শোনা গেছে,—ঠাকুমা হরে হরে কেষ্ট বললে আর বললে,—অলপেয়ে হারাণের বৌ আজ কালিয়াটা ঠিক নুনে পুড়িয়ে রাখবে।"

ঠাকুমার হতের ঘণ্টা থেমে গেছে। মুখটা গেছে হাঁ হয়ে চোখ কপালে। আমার মনে হল, ও'র মাথার টিকিটাও বিস্ময়ে খাড়া হয়ে গেছে। ঢোক গিলে বললেন,—"ও ম্যাস্টার, এ আমার কি হল গো? পাপী তাপী মনিষ্যি, ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে কত আজে বাজে চিন্তা মাথায় আসে। তা মনে এলেই সে কথা রেডিও গাঁক গাঁক করে বলে দেবে? একি ভুতুড়ে রেডিওর পাল্লায় পড়লুম গো!" ঠাকুমা ডাক ছেড়ে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন।

স্যার বললেন,—"ছি ছি পিসীমা, চুপ করুন। আমাকে একটু ভাবতে দিন। আচ্ছা, পদ্ম, পলাশ, তোরা নিচে যা। রেডিওতে কি বললে, দুমিনিট বাদে ওপরে এসে খবর দিবি আচ্ছা পিসীমা, আপনি ফের পুজোয় বসুন। এবারে ঘণ্টায় হাত দেবেন না, শুধু পুজো করুন।"

কিছুক্ষণ বাদে পদ্ম এসে খবর দিলে, রেডিওতে খেয়াল চলছে, অন্য কোনও বদখেয়ালী নেই। স্যার বললেন,—"গুড। পিসীমা, আবার ঘণ্টা নেড়ে আরতি শুরু করুন। পদ্ম, ফের নিচে যা, খবর দিবি।"

এক মিনিটের মধ্যেই পদ্ম দুদ্দার করে এসে বললে, —"স্যার, ঠাকুমা বাবা মা আর রেডিওর ভূতকে ড্যাকরা অলপেয়ে বলে গালাগাল দিচ্ছে, আর আপনাকেও—"বলে চুপ করে গেল।

আমি দারুন অবাক হয়ে গেলুম। ঠাকুমা ঘণ্টা নেড়ে আরতি করছিল, একবারও মুখ খোলেনি। তবে?

ঠাকুমা এবারে ভ্যাক্ করে কে'দে ফেললেন। স্যার মুচকি হেসে বললেন,—"পিসীমা, আপনার পুজোর ঘণ্টাটা দেখব।"

ঠাকুমা শুধু বললেন,—'কাচা কাপড় তো?"

ছোট্ট, সুন্দর রুপোর ঘণ্টা। স্যার উল্টে পাল্টে দেখে বললেন—'পিসীমা, এর ভেতরের গুলিটা কি কাচের?'

ঠাকুমা বললেন,—'না বাবা, এ আমার গুরুদেবের হাতের ঘণ্টা। ওর গুলিটা আসল স্ফটিকের তৈরী।'

স্যার কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন,—বুঝলুম। পিসীমা, এই ঘণ্টা নাড়লে কিন্তু আপনার মনের কথা সরাসরি রেডিওর মধ্যে চলে যাবে। একটা সাধারণ পেতলের ঘণ্টা আনান।'

হ্যাঁ এই হল রহস্য। বুঝলি কিছু তপেশ? ঠাকুমার হাতের ঘণ্টাটা হাই ফ্রেকুয়েন্সী অসিলেটর হয়ে যাচ্ছিল। আর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাসিস্টেমে উত্তেজনা ঘটে। ব্রেনের মধ্যে ছোট ছোট বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। ঠাকুমার জোরালো গালাগালি ইত্যাদি তাঁর ব্রেনে যে ইলেকট্রিক ওয়েভস্ সৃষ্টি করছিল সেগুলি হাইফ্রেকুয়েন্সি অসিলে-শানের ওপর মডুলেশান সৃষ্টি করছিল। ঠিক যেমনটি রেডিও ষ্টেশানে হয়। ছাতের পাশেই এরিয়েল। ঐ বার্তা-বাহী রেডিও ওয়েভস্ সটান রিসিভারে চলে যাচ্ছিল। ভুতুড়ে রেডিও ঠাকুমার মনের কথা ডিটেক্ট করে প্রচার করে দিচ্ছিল।'

তপেশ হাঁ করে থেকে বললে,—'ঘণ্টা কি করে হাই-ফ্রেকুয়েন্সী রেডিও ওয়েভস্ তৈরি করতে পারে?'

বঙ্কুবাবু বললেন,—'বুঝলি না? ঘণ্টার গুলিটা স্ফটিকের, মানে খাঁটি কোয়ার্টজের। বিশেষভাবে কাটা কোয়ার্টজ্ ক্রিস্টাল দুপাশ থেকে চাপ খেলে সামান্য ভোল্টেজের সৃষ্টি করে। একে বলে পিয়েজো ইলেকট্রিক এফেক্ট্। ঠাকুমা খুব দ্রুত ঘণ্টি নাড়তেন, যাকে বলে হাই ফ্রেকুয়েন্সীতে। ফলে দ্রুত বিদ্যুৎ কাঁপনের ফলে ঘণ্টিটা হাই ফ্রেকুয়েন্সী অসিলেটর বা রেডিও ট্রান্সমিটার হয়ে যেত!'

তপেশ বললে,—'রেডিও ওয়েভস্ তো চারশো পাঁচশো কিলোসাইকল্ মানে সেকেন্ডে চার পাঁচ লক্ষ বার কাঁপে। ঠাকুরমার ঘণ্টা নাড়া কি চারশো পাঁচশো কিলোসাইক্লে চলতো? গুল মারবার জায়গা পাওনি? তাহলে ওঁর হাত নাড়া কারো চোখেই পড়তো না!'

বঙ্কুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন,—'আমি কি বলেছি যে ওর ঘণ্টানাড়ানো হাত কারো চোখে পড়তে?

কাগজের জন্ম কথা

তপনকুমার সিংহ

কাগজ আমাদর নিত্য ব্যবহারের জিনিস। আধুনিক যুগের মানুষ কাগজের সাহায্য ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে কাগজের ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাগজ আবিষ্কারের আগে মানুষ তালগাছের পাতা, গাছের ছাল বা পাথরের ফলক লিখবার জন্য ব্যবহার করত। অনেক দেশে মাটির ফলকের উপরে লেখা হত। তারপর সেই ফলকটাকে পুড়িয়ে স্থায়ী করে নেওয়া হত। বেবিলনের বই পত্র লেখা হত পশুর চামড়ায়। অনেক দেশে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লেখা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিরা বহু পুঁথি তালপাতায় লিখে গেছেন। মিশরের বহু পুঁথি প্যাপিরাস গাছের ছালে লেখা হয়েছে।

কাগজের ইংরাজী নাম পেপার (Paper)। এই পেপার কথাটা এসেছে প্যাপিরাস কথা থেকে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা প্যাপিরাস নামে একরকম গাছের ছালে পুঁথি লিখত। তাই পরবর্তীকালে এই প্যাপিরাস থেকে পেপার কথার প্রচলন হয়।

প্রাচীন চীনেই সম্ভবতঃ কাগজের প্রথম প্রকাশ ঘটে। তাই চীনারাই প্রথম কাগজ তৈরী করতে শেখে। তারা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কাগজ তৈরী করত। তাদের এই সফলতা মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে একটা বৈপ্লবিক নিশানা। চীনাদের কাছ থেকে আরবেরা কাগজ তৈরী করতে শেখে। আরব সভ্যতায় কাগজের ব্যবহার ছিল প্রচুর। আরবদের কাছ থেকেই কাগজ তৈরীর কৌশল দুদিকে ছড়িয়ে যায় ভারতবর্ষ ও ইউরোপের দিকে। ভারতে মধ্যযুগ থেকেই কাগজের ব্যবহার চলতে থাকে। হাতে গড়া কাগজকে তুলট কাগজ বলা হয়।

বর্তমানকালে পৃথিবীর নানাদেশে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ তৈরীর চেষ্টা চলতে থাকে। অনেক চেষ্টার পর ফারভিনের ডিকশন 1803 খ্রীষ্টাব্দে কাগজ তৈরী করতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের লোক।

প্রাচীন কালের মত প্রথম যুগের কাগজের কলেও ছেড়া কাপড়ই উপাদান হিসাবে ববহার করা হত। কিন্তু এই-ভাবে যে কাগজ পাওয়া যেত তার দাম খুবই বেশী হত। তাই বৈজ্ঞানিকেরা অন্য সস্তা উপাদান থেকে কাগজ তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানীর বৈজ্ঞানীকেরা গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরী করতে সফল হন এবং সর্ব-সাধারণ ব্যবহার করার সুযোগ পেল।

একালে কাগজের কলগুলোতে প্রধানতঃ একশ্রেণীর বাঁশই উপাদান হিসাবে করা হচ্ছে। ভারতের হিমালয় পর্বতের পাদদেশে। তরাইনের বনে প্রচুর এই শ্রেণীর বাঁশ জম্মায়। আর সাবাই নামে একপ্রকার ঘাস থেকেও কাগজ তৈরী করা হচ্ছে।

কাগজ তৈরী করতে গেলে প্রথমে বাঁশগুলোকে খুব ছোট ছোট ভাবে কেটে ফেলতে হবে। তারপর সেই বাঁশের টুকরোগুলিকে পেষাই যন্ত্রে ফেলে পিষে ফেলতে হবে। সেই পেষাই বাঁশ বা সাবাই ঘাস, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতির সঙ্গে কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম সালফেট মিশিয়ে অনেকক্ষণ ফোটাতে হবে। তারপর ঐ তরল পদার্থের সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে, ওটাকে ব্লিচ বা বর্ণহীন করা হয়। এরপর যদি দরকার হয় তার সঙ্গে লাল, নীল বা যে কোন রং মিশিয়ে নানা রং-এর কাগজের মণ্ড তৈরী করা হয়। সবশেষে এই মণ্ডকে যন্ত্রে ফেলে রোলারের সাহায্যে পাতলা ভাবে তৈরী করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই পাতলা জিনিষটাই কাগজ।

এখন পৃথিবীর সব দেশই কাগজ তৈরী করছে। ভারতও পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় কলে প্রচুর কাগজ তৈরী করা হচ্ছে। তবুও এই কাগজ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই বিদেশ থেকে কাগজ প্রধানতঃ নিউজপ্রিন্ট আমদানি করতে হয়।

আধুনিক কালের সভ্যতাকে কেউ কেউ বলেন যন্ত্রের যুগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কাগজের যুগ। বর্তমান সভ্যতার যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে, তা ঐ কাগজের মাধ্যমেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থান পেয়েছে, তাই আমরা চেষ্টা করব কাগজের উৎপাদন বাড়াতে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করতে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

আয়োজিত

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতা

বিষয়—বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য

প্রথম পুরস্কার 40 টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার 30 টাকা, তৃতীয় পুরস্কার 20 টাকা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য

প্রথম পুরস্কার 30 টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার 25 টাকা, তৃতীয় পুরস্কার 20 টাকা।

—নিয়মাবলী—

- মার্জিনসহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে গল্প লিখে পাঠাতে হবে।
- গল্প 400 শব্দের মধ্যে লিখতে হবে।
- নীচের কুপনটি পূরণ করে গল্পের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত গল্প ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।
- পুরস্কৃত গল্প কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।
- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ 31 জুলাই 1984।

প্রতিযোগীর নাম……………………………………বয়স……

ঠিকানা……………………………………………………

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা……………………………………

শ্রেণী…………………রচনার বিষয়……………………

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর……………………………………

প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর……………………………

নিজের হাতে বানানো আমার অভূতপূর্ব হাউই
মহাকাশে পাঠিয়ে দেব আগামী মাসের সাতুই,
আলোর গতি ছাড়ালে পর হতভম্ব রাকেশ
হাত তালি দিয়ে বলতে থাকবে, বাঃ বাঃ বেশ বেশ!
আট মিনিটে সূর্য থেকে আলো আসার আগে
আমার যন্ত্র দেখতে পাবে সূর্য কোথায় জাগে;
সন্ধেবেলায় অস্ত যখন আকাশ অন্ধ ক'রে
একটি লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল মাইল জোরে
উড়বো আমি রোদের পিছে, সময় থামিয়ে রেখে।
যা কখনো কেউ পারেনি, এই পরীক্ষা দেখে
রোমার ফিজো মাইকেলসনের যেখানে যত শিষ্য
ধন্য ধন্য বলতে বলতে কাঁপিয়ে দেবে বিশ্ব।
এর পরেতে আরও গতি বাড়বে যখন আমার
ইতিহাসকে নিজ চক্ষে দেখতে পাবো আবার ঃ
মোগল-বাদশা আর্যযুগের প্রত্নগন্ধ অতীত—
সিলেবাসের শুকনো পুঁথি তখন হবে পতিত।

পেঁচা

অজয় হোম

উলুক বর্গের (স্ট্রিগিফরমেস) পাখিরা সবাই সকাল-সন্ধ্যের গোধূলির এবং নিশাচর। এদের চোখ গোল চাকতির মধ্যে এবং মানুষের মতো পাশাপাশি। কেবল একটি মাত্র গণের (জিনাস) পাখিই ব্যতিক্রম।

মানুষের এই বর্গের পাখিদের নিয়ে অহেতুক ভয় ও নানা কুসংস্কার আছে। ভয়টার উৎস রাতের অন্ধকারে এদের রোমহর্ষক ডাক থেকে। আবার দেশবিদেশে দেবীর বাহনরূপে পূজোর বেদীতেও একে স্থান দিয়েছে। আমাদের যেমন লক্ষ্মীর বাহন, গ্রীক পুরাণে তেমনি জ্ঞানের দেবী অ্যাথিনীর সঙ্গী। যার থেকে ইংরেজি 'ওয়াইজ আউল', 'ওয়াইজ ওলড্ আউল' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি।

উলুক বংশ

উলুক বর্গে একটিমাত্র বংশ উলুক (স্ট্রিগিডি)। এই বংশকে দুটি উপবংশে ভাগ করা হয়েছে— শ্বেতোলুক (টাইটোনিনি) ও উলুক (স্ট্রিগিনিনি)। উলুক বংশের প্রতিটি প্রাণীরই দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। গোল ডানায় নরম পালকের জন্যে অত্যন্ত দক্ষ ও নিঃশব্দ শিকারী। শিকারকে তার অজান্তে নখরের সাহায্যে ধরে একদম সোজাসুজি গিলে ফেলে। কেবল বড়ো কোনো প্রাণীকে ধরলে চঞ্চুর সাহায্যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যেসব অংশ হজম হয় না সেগুলো উপরে ফেলার জন্যে তার আস্তানার কাছে গেলে জানা যায় তারা কি খায়। পাশা-পাশি দুই বড়ো চোখে জ্বলন্ত পার্টাকিলে, হলুদ বা কমলা কণীনিকায় সামান্যতম আলোর স্পর্শেই দেখতে পায় কিন্তু নিছক অন্ধকারে একদম দেখতে পায় না, তখন অন্ধ। চোখ চাকতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসানো হলে কি হবে এই অসুবিধেটা দূর করে মাথাটা 270° পুরো গোল করে ঘুরিয়ে। মোটা সুদৃঢ় চঞ্চুর চারপাশে সংজ্ঞাবহ সরু খোঁচা লোম পালক দিয়েই তার শিকারকে অনুভব করে। কারণ দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে পায়, কাছের জিনিস দেখে কষ্ট করে। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী, তার মধ্যে নাকের ছাঁদা লুকানো। বিপদ আশঙ্কা করলে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সব পালক ফুলিয়ে তুলে শত্রুকে যা নয় তার চেয়ে নিজেকে ডবল করে দেখিয়ে ভয় দেখায়। প্রথম ডিম পাড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই তা দেয়। যে কোনও গর্তে তা গাছই হোক, পাহাড়ের খোঁদলে হোক, অন্য কোনও পাখির পরিত্যাক্ত বাসা বা মাটির উপর গর্তেই হোক সেখানেই ডিম পাড়ে।

উলুক বংশকে 11টি গণে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, শ্বেতোলুক (টাইটো), পিঙ্গলক (ফোডিলাস), উর্ধ্বকর্ণ (ওটাস), বায়সান্তক (বিউবো), হিমোলুক (নাইকটিয়া), পেচক (নিনকস্), ভুডুল (গ্লকিডিয়াম), কুবয় (অ্যাথেনি), বনঘুক (স্ট্রিকস্), কর্ণিক (এসিও) এবং পক্ষ্মপাদ (ঈগোলিয়াস)।

লক্ষ্মী পেঁচা

কোন্ ছোটোবেলা থেকে যে এই পাখিকে মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কলকাতা শহরের বুকে বা গাঁ-গঞ্জে আজ প্রথম দেখার কথাটা একদম মনে নেই। বেশ বড়সড় পাখির নিঃশব্দে ওড়াটা দেখতে ভালো লাগতো। একবারের কথা মনে আছে। সেটা ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে। অল্প বয়েস তখন, স্কুলে পড়ি। গরমের ছুটিতে ওখানে আমাদের বাড়িতে আছি। বিকেলের দিকে 'পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে' করে পিঁপড়েরা উড়তে আরম্ভ করল। কাক শালিক আর ফিঙেতে মিলে উড়ন্ত পিঁপড়ে ধরে ধরে খেতে লাগল। আমি বারান্দায় চেয়ারে বসে সেই মহাভোজ দেখছি। সন্ধ্যা প্রায় নেমেছে। আধো গোধূলি আধো আঁধার! গোলাপ, বেল, আতা, জাম, আম ইত্যাদি গাছের গোড়ায় কাকলাস বা গিরগিটি (ক্যালোটেস ভেরসিকলার) আছে জানতাম। মাঝেমাঝে সরসর করে গাছের ডালে, পাঁচিল বা মাটির উপর দিয়ে দৌড়তেও দেখেছি। কিন্তু বাগানে যে এত ছিল তা জানতাম না। তারা এসে মাটি থেকে টপাটপ পিঁপড়ে তুলে খেতে লাগল। কোথায় ছিল কতকগুলো কটকটে ব্যাঙ (বুফো মেলানোসটিকটাস) তারাও থপথপ করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শুরু করে দিল ভোজ। হঠাৎ পাশের বাড়ির মহুয়া গাছের উপর থেকে নেমে এল দুটো পাখি। কিছু বোঝবার আগেই একটা গিরগিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মহুয়া গাছের পাতার আড়ালে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে এসে আরও দুটো নিয়ে গেল। বার-কতক এই রকম হবার পর ব্যাঙ ও গিরগিটিরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে ভোজের বিপদ অনুভব করতে পেরে আত্ম-গোপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাণ্ডকারখানা দেখে অসম্ভব হাসি পাওয়াতে আমি হেসে ফেললাম।

কয়েক বছর বাদে যে সব পশুপাখি কেউ পোষে না তা

যখন পোষা শুরু করি তখন হাতিবাগানের হাট থেকে একটা কিনে এর সুন্দর চেহারাটা দেখেছিলাম।

পাখিটা উলূক বংশের (স্ট্রিগিডি) অন্তর্গত শ্বেতোলূক গণের (হাইটো) এক প্রজাতি, নাম—লক্ষ্মী পেঁচা (টাইটো আলবা), ইং. বার্ণ আউল; হিন্দি কুরাইয়া; বাড়ি চুরি।

লক্ষ্মী পেঁচা লম্বায় 36 সেমি (14 ইঞ্চি) অদ্ভুত হরতনের মতো গোল চাকতি মুখ। শক্ত পালক দেখায় যেন প্লাইউডের পাতলা এক টুকরো কাঠ কেটে সাদা চাকতিটা তৈরী। তার মধ্যে ড্যাবা ড্যাবা দুই চোখে। থেকে থেকে একটা চোখ বুজিয়ে চোখ মারে। সোজা নেমেছে লম্বাটে চঞ্চু.গোড়াটা বসা। নাকের ছ্যাঁদা ডিম্বাকার। উপরটা সোনালি হলদেটে-লাল ও ধূসর, তার উপর সর্বত্র কালো সাদা ফুটকি। ঘাড় ও ডানা হলদেটে-পাটকিলে। নিচটা রেশমী সাদা, অল্পবিস্তর হালকা হলদেটে-লালের আভা তার উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট। কণীনিকা গাঢ় পাটকিলে, কখনও হালকা বাদামী বা কালো। চঞ্চু মাংসল সাদা; চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো উন্মুক্ত ঝিল্লী মাংসল। পা ও আঙুল মাংসল পাটকিলে, নখর গাঢ়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান—1000 মি উচ্চতার মধ্যে পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ্ এবং শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় পুরণো পরিত্যক্ত দুর্গ, ভাঙা প্রত্নতাত্ত্বিক কাঠামো, গুহা, পরিত্যক্ত কুয়ো; খালি এবং বসতিপূর্ণ বাড়ির আলসে-কার্নিসের গর্তে। একটি উপজাতি (টা আ ডেরোপাটরফি), বাসস্থান—আন্দামান। অপর প্রজাতি —ঘাস পেঁচা (টা কাপেনসিস)।

খাদ্য—চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি, ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুর, চামচিকা, টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ ইত্যাদি। ডাকে নানারকম চিল-চেঁচানি; মুরগির চাপা ডাক, নাক ডাকার মত; ক্রুদ্ধ হিসহিস এবং রাগলে দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি। প্রজননকালে এইসব নানারকম ডাক ও আওয়াজ শোনা যায় বেশি।

স্বভাব—খেতখামারের প্রভূত উপকারী প্রধানত সকাল-সন্ধ্যের গোধূলি ও রাত্রে বিচরণ করে। প্রখর রোদের আলো সহ্য করতে পারে না, সেটা বোঝা যায় কাক বা ফিঙেরা তাড়া করলে। আবার এও দেখা যায় দিনের কড়া আলোয় কোনরকম অসুবিধে বোধ না করে ঘেসো মাঠের 3-4 মি উঁচু দিয়ে উড়ে গিয়ে শূন্যে ডানা নাড়িয়ে এক জায়গায় প্রায় আধ মিনিট স্থির হয়ে জমিতে থাকা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত দিনের বেলায় একা বা

জোড়ায় কোনো অন্ধকার জায়গায় খাড়া দুচোখবুজে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। সন্ধ্যে হলেই একটা তীব্র চিল-চেঁচানি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে। দিনের বেলায় যেখানে আশ্রয় নেয় তার তলায় দেখা যায় হজম না হওয়া শিকার প্রাণীর মাথা ও দেহের নানা অংশের হাড়ের টুকরো পড়ে আছে। প্রায়ই দেখা যায় শহরে সন্ধ্যের বাতি জ্বললে ভূতের মতো নিঃশব্দে ওড়ার সঙ্গে একটা চেঁচানি দিয়ে ওঠে।

প্রজননকালের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। বছরের যে কোনও সময়ে বাসা না বানিয়ে নিরিবিলি জায়গায় তা গাছের ফোকরেই হোক, গুহাতেই হোক বা বাড়ির আনাচে কানাচে ছাদের আলসে বা কার্নিসের ফাঁকে কিছুটা গোল সাদা মসৃন ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি 48 ঘণ্টা অন্তর অন্তর। দেখা যায় একই জায়গায় বছরের পর বছর ডিম পাড়তে। স্ত্রী-একাই ডিমে তা' দেয় কিন্তু সন্তান প্রতিপালন করে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই। 32 থেকে 34 দিনে ডিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ 40·7 × 32·5 মিমি।

আলোক

অলক চক্রবর্তী

আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান অনেক দিন ধরেই চলছে। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। এবার আলোচনা আলোক-বিজ্ঞান নিয়ে। অনেক প্রশ্নোত্তর। তাই এই অংশ তোমাদের কাছে দু'টি ভাগে উপস্থিত করতে চাই। এবারে প্রথম ভাগটি প্রকাশিত হল।

প্রশ্ন 1ঃ চাঁদে পাহাড়ের গায়ের ছায়ায় কোনো জিনিসকে দেখা না যাওয়ার কারণ কি?

প্রশ্ন 2ঃ চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার জন্যে ওপরের অংশে সূর্যের আলোর কোনপ্রকার বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় না বলে পাহাড়ের গায়ের ছায়ায় কোন জিনিসকে দেখা যায় না।

প্রশ্ন 2ঃ আয়নার পেছনদিকে অস্বচ্ছ প্রলেপ দেওয়া থাকে কেন?

উত্তর 2ঃ কাঁচের প্লেটের ওপর আলোকরশ্মি আপতিত হলে ওর বেশীরভাগ অংশই কাঁচের মধ্য দিয়ে অন্যদিকে চলে যায়; অতি সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়। তাই কাঁচের প্লেটের পেছনে অস্বচ্ছ কোন পদার্থের প্রলেপ লাগলে আলোর বেশীর ভাগ অংশই কাঁচের বিভেদতল থেকে প্রতিফলিত হয় ও ওটাকে আমরা আয়না হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

প্রশ্ন 3ঃ কোন কোন আয়নায় প্রতিবিম্ব বিকৃত দেখায় কেন? কোন আয়না সমতল কিনা কি করে বুঝবে?

উত্তর 3ঃ কোন বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মি সমতল আয়না কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠন করলে ঐ আয়না থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ও বস্তু দূরত্ব সব সময় সমান হয়। আয়না অসমতল হলে বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিম্ব বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন দূরত্বে তৈরী হয়, ফলে সমস্ত প্রতিবিম্ব বিকৃত দেখায়। তাই কোন কোন আয়না যেগুলোর কাঁচের ঘনাঙ্ক সব জায়গায় সমান হয় না বা আয়না সব জায়গায় সমান পুরু হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে অসমতল পৃষ্ঠে প্রতিফলনের জন্যেই প্রতিবিম্ব বিকৃত হয়।

কোন আয়নায় কোনো সরল লাঠির (বা জানালার লোহার শিক) প্রতিবিম্ব যদি সরল না হয় তবে আয়নাটা অসমতল, সরল হলে আয়নাটা সমতল হবে।

প্রশ্ন 4ঃ ঘষা কাঁচ ভেজালে তখন ওটা অনেকখানি স্বচ্ছ মনে হয় কেন?

উত্তর 4ঃ ঘষা কাঁচের পৃষ্ঠ অসমতল বলে ওতে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। কিন্তু জলে ভেজালে ওটার পৃষ্ঠদেশে জলের পাতলা আস্তরণ পড়ে ওটাকে প্রায় সমতল করে দেয়। আবার বায়ুসাপেক্ষে জল ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় সমান হয় বলে আলোকরশ্মির কিছু অংশ কাঁচের মধ্য দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে যায়। কাজেই, দেখা যাচ্ছে জলে ভেজা ঘষা কাঁচের আবরণ অনেকটা সাধারণ স্বচ্ছ কাঁচের মতো।

প্রশ্ন 5ঃ দুপুর বারোটার চেয়ে বিকেল চারটেয় জলাশয়ে সূর্যের প্রতিবিম্ব অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায় কেন?

উত্তর 5: সূর্যের আলো দুপুর বারোটায় যে আপতন কোণে আপতিত হয়, বিকেল চারটেয় তার চেয়ে বেশী আপতন কোণে আপতিত হয় বলে ওর অনেক বেশী অংশের প্রতিফলন ঘটে। এইজন্যে সূর্যের বিকেলের প্রতিবিম্ব বেশী উজ্জ্বল দেখায়।

প্রশ্ন 6ঃ বইয়ের পাতা সাদা ও খসখসে করা হয় কেন?

উত্তর 6ঃ সাদা রং কোন বর্ণের আলোই শোষণ না করে প্রতিফলিত করে বলে বইয়ের পাতা সাদা করা হয়।

খসখসে করার কারণ, যাতে ওতে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়ে বইয়ের পাতার সমস্ত অংশই সমান উজ্জ্বল দেখায়।

প্রশ্ন 7ঃ পিন হোল ক্যামেরার ছবি উল্টো পড়ার কারণ কি?

উত্তর 7ঃ আলো সবসময় সরলরেখায় চলে। লক্ষ্য-বস্তুর ওপর দিক থেকে আসা রশ্মি সরলরেখায় চলে পিনহোল ক্যামেরার ছিদ্র দিয়ে গিয়ে ক্যামেরার প্লেটের নীচের দিকে পড়ে, আবার বস্তুর নীচের দিক থেকে আসা রশ্মি একইভাবে প্লেটের ওপর দিকে পড়ে, ফলে বস্তুর ছবি উল্টো হয়।

[ক্রমশঃ]

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

দিবাকর সেন

আধুনিক ভারতবর্ষের নবযুগের সূচনার প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বিরাট আদর্শের ফলশ্রুতি সেকালের অনেক বিখ্যাত মানুষ। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁদেরই অন্যতম।

1833 সালের 2রা নভেম্বর তারিখে মহেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পৈত্রিক নিবাস হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে। পিতার নাম তারকনাথ সরকার। মহেন্দ্রলাল মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবা ও নয় বছর বয়সে মাকে হারান। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় তিনি তাঁর ছোট মামা মহেশচন্দ্র ঘোষের কাছে থেকে পড়াশুনো শুরু করেন। 1849 সালে হেয়ার স্কুল থেকে সর্বোচ্চ 'জুনিয়র বৃত্তি' লাভ করে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নানা বিষয়ে কৌতূহলী ছিলেন। প্রত্যেকটি ঘটনার কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার প্রবল আগ্রহ ছিল। কিশোর বয়সে তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক। ছাত্র অবস্থায় মিল সাহেবের লজিক বই ও রেঃমিলনরের লেখা 'টুর রাউণ্ড দি ক্রিয়েশন' বইটি পড়ে তিনি ফলিত বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হন। তখন আমাদের দেশে ফলিত বিজ্ঞান পড়ার কোন ব্যবস্থা চালু ছিল না। একমাত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা চালু ছিল। 1854 সালে মহেন্দ্রলাল কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। 1860 সালে এল. এম. এস ও 1863 সালে এম. ডি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেই সূত্রে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি'র সম্মান লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে মহেন্দ্রলাল ছিলেন অসাধারণ ধীসম্পন্ন খেয়ালী ছাত্র। তিনি যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন তখন একবার মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আর্চারের অনুরোধে আলোকবিদ্যা (Optics) বিষয়ক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার শ্রোতারা ছিলেন কলেজেরই পঞ্চম বর্ষের ছাত্ররা।

ডাক্তারী পাশ করার পর মহেন্দ্রলাল স্বাধীনভাবে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করেন। খুব অল্পসময়ের মধ্যে যশ ও অর্থ দুইই তাঁর করায়ত্ত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ডাঃ মর্গানের লেখা একটি বই পড়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনুপ্রাণিত হন ও এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এলোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। এজন্য সেসময় তাঁকে অনেক সমালোচনা ও বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়েছিল। কারণ মর্গানের বইটি পড়ার আগে মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেন।

1868 সাল থেকে মহেন্দ্রলাল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার 1869 সালের আগষ্ট সংখ্যায় তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য দেশের লোকের

দ্বারা পরিচালিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীর কথা বলেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমই দেশে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' বা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের' সূচনা হয়।

তাঁর এই প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা দেশবাসীর কাছে খুব সমাদৃত হয়েছিল। 1870 সালের 3রা জানুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে মহেন্দ্রলাল এ বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হন ও ধীরে প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী কালে নোবেল বিজ্ঞানী সি. ভি. রমণ এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর গবেষক জীবন শুরু করেন ও নোবেল পুরস্কার পান।

মহেন্দ্রলাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। 'বিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠার আগে তিনি ছাত্রদের জন্য পাঁচশ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে দান করেছিলেন। 1898 সালে গঠিত 'সায়েন্স ডিগ্রী কমিটিরও' তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডঃ পি. কে. রায় ও ডাঃ নীলরতন সরকার। পরে এই কমিটির সুপারিশেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়।

1904 সালের 23শে ফেব্রুয়ারী এই অক্লান্ত বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রথম মানুষটির মৃত্যু হয়। বর্তমান বছরটি তাঁর 150তম জন্মজয়ন্তী পূর্তি বছর। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটিতে ও অন্যত্র বৎসর ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে।

কেমন করে কাজ করে

এরোপ্লেন কেন ওড়ে

এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে 'ভারী'। সুতরাং সেটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে গেলে নীচ থেকে ওপরে একটা বল প্রয়োগ করতে হয়। এরোপ্লেন যখন ওড়ে তখন মোট চার রকম বল তার ওপরে কাজ করে। বলগুলো হল ঃ ওজন, উত্থান-বল, ঘাত এবং পশ্চাৎকর্ষণ (১নং ছবি)।

ওজন তো তোমরা সবাই জানো ঃ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল। এরোপ্লেনকে সেটা টেনে নামিয়ে নিতে চায় নিচে।

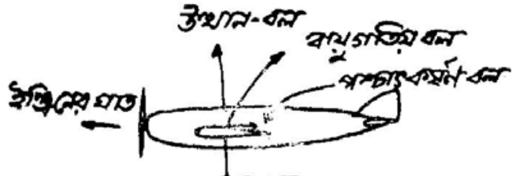

১নং ছবি// এরোপ্লেনের ওপরে মোটচার রকম বল কাজ করে

আর উত্থান-বল তৈরি হয় বেশ অদ্ভুত কায়দায়। এরোপ্লেনের যে-দুটো বিশাল ডানা থাকে তাদের ওপরের দিকে বায়ুচাপ কম হয়, নিচের দিকে হয় বেশি। ফলে উত্থান-বল এরোপ্লেনকে ওপর দিকে ঠেলে দিতে চায়। কিন্তু উত্থান-বল তৈরি করতে গেলে এরোপ্লেনকে বাতাস কেটে ছোটাতে হবে। এই কাজটি করে ঘাত—যে ঘাত তৈরি করে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন। প্লেন ছোটার সময় বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে একটা পিছুটান তৈরি হয়—যাকে বলা হয় পশ্চাৎকর্ষণ বল। অতএব প্লেনের ইঞ্জিন বেশ শক্তিশালী হওয়া দরকার যাতে সে পশ্চাৎকর্ষণ বলকে কাটিয়ে উঠতে পারে।

এরোপ্লেনের ডানাকে খাড়াভাবে কাটলে যে চেহারা চোখে পড়বে তাকে বলা হয় এরোফয়েল সেকশান। এই সেকশানের চেহারায় রদবদল ঘটিয়ে উত্থান-বলের তুলনায় 'পশ্চাৎকর্ষণ'

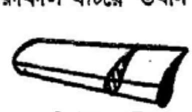

২নং ছবি: এরোফয়েল সেকশান

বলকে অনেক কম রাখা যায়। ২নং ছবিতে এরোপ্লেনের ডানার অংশ দেখানো হলো।

এরোপ্লেনের ডানা যখন বাতাস কেটে এগোয়, তখন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ডানা যেদিকে এগোয় তার বিপরীত দিকে বাতাস বইতে থাকে ডানার তল ঘেঁষে। ডানার সামনের কিনারা থেকে পিছনের কিনারায় বাতাস পেঁছয় দু রকমভাবে ঃ ডানার নিচের তল ঘেঁষে যে বাতাস বয় সে উপরিতলের বাতাসের চেয়ে কম সময়ে পেঁছে যায় পিছনের কিনারায়। এই দু-রকমের গতিবেগের জন্য পিছনের কিনারা বরাবর বাতাসের ঘূর্ণি তৈরি হয়। ঘূর্ণির আবর্তন উপরিতলের বাতাসের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, দু-দিকের বাতাসই একই সময়ে সামনের কিনারা থেকে পিছনের কিনারায় পেঁছে যায়। যেহেতু উপরিতল বরাবর বাতাসের পথের দৈর্ঘ্য নিচেরতলের চেয়ে বেশি, সেহেতু বলা যায়, উপরিতলের বাতাসের গতিবেগ নিচের তলের চেয়ে বেশি (৩নং ছবি)। উপরিতলের বাড়তি গতিবেগ ডানার পিছনের কিনারা বরাবর আর ঘূর্ণি তৈরি হতে দেয় না। বরং ডানার উপরিতলের প্রতিটি বিন্দুতে বাতাসের চাপ নিচের তলের তুলনায় কমিয়ে দেয়। চাপের এই পার্থক্যই তৈরি করে অতি দরকারি উত্থান-বল।

উত্থান বলের ব্যাপারটা তোমরা হাতে নাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা কাগজের পৃষ্ঠা দু-হাতে মুখের

৩নং ছবি: ডানার গা ঘেঁষে বাতাসের গতি

সামনে ধরো। তারপর কাগজের উপরিতল বরাবর জোরে ফু দাও। দেখবে কাগজটা ওপর দিকে ভেসে উঠছে। এর কারণ; ফুঁ দিলে কাগজের উপরিতলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়, আর চাপ কমে যায়। কিন্তু কাগজের নিচে বাতাস মন্থর বলে চাপও থাকে বেশি। ফলে নিচের অতিরিক্ত চাপ কাগজের পৃষ্ঠাকে ভাসিয়ে তুলতে চায় ওপর দিকে। এরোফয়েল সেকশান এই কাজটিই করে আরও নিখুঁতভাবে। সেই জন্যেই তো অতো বড় 'ভারী' এরোপ্লেনটা ভেসে থাকতে পারে আকাশে।

২নং ছবির এরোফয়েল সেকশানের নিচের অনুভূমিক রেখাটিকে বলা হয় জ্যা-রেখা বা কর্ড লাইন। বাতাসের গতির অভিমুখের সঙ্গে জ্যা-রেখা কতোটা কোণ তৈরি করছে তার ওপরে নির্ভর করে বিভিন্ন বলের মান। ফলে চার রকম বল মিলে যে বায়ুগতীয় বল তৈরি করে, তারও হের-ফের ঘটে এই কোণের ওপর নির্ভর করে। এই কোণকে বলা হয় আপতন কোণ বা আক্রমণ কোণ। আপতন কোণ বাড়লে উত্থান-বলও বেড়ে যায়। সেইজন্যই প্লেন ওপরে তুলতে হলে পাইলট প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে দেয় ওপর দিকে যাতে আপতন কোণ বেড়ে যায়। তারপর ওপরে ওঠার কাজ শেষ হলেই সে প্লেনটিকে অনুভূমিক করে দেয়। বুঝতেই পারছো; এরোপ্লেন নামাতে হলে তার মুখ ঘোরাতে হবে নিচের দিকে।

আগামী সংখ্যায় : জিপার বা চেইন

এছাড়া উড়ন্ত এরোপ্লেনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়। এই পাতগুলো ইচ্ছে মতো ঘোরানো যায়। এগুলোর নাম হলো এইলিরন, ফ্ল্যাপ এবং এলিভেটর। এইলিরন ও ফ্ল্যাপ থাকে ডানায়। প্রথমটি ব্যবহার করা হয় এরোপ্লেন শূন্যে ঘোরানোর সময়, আর ফ্ল্যাপ কাজে লাগে প্লেন ওঠা-নামার সময়। এলিভেটরগুলো সাধারণতঃ থাকে এরোপ্লেনের লেজে। প্লেনের মুখ ওপর-নিচে ঘোরাতে এলিভেটরের, ধাতব পাতগুলো সাহায্য করে।

অনীশ দেব

বুদ্ধি নিয়ে খেলার উত্তর

এক id, iig, iib, ivh, vl, vik, viii, lxc, xa, xif, xiie.

দুই 14, 30 ; 55

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$ অথবা

$$1+2^2+3^2+4^2+\cdots\cdots n^2$$

যেখানে n হচ্ছে একদিকে ছোট্ট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা।

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চমাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, ডঃ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুরদীশচন্দ্র দত্ত

উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান—ডঃ প্রতীপকুমার চৌধুরী ডঃ নিতাই মুখোপধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা—অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

দর্শনশাস্ত্রের ভূমিকা—ডঃ বিশ্বনাথ সেন

ভাষাচর্চা ও সাহিত্যকথা—(উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা দ্বিতীয় পত্র)—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ নির্মল কুমার দাশ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ— পঞ্চদশ ও ও ষোড়শ শতাব্দী —ডঃ শ্যামল সেনগুপ্ত

Higher Secondary English Grammar & Composition—Deb kumar Chatterjee (New syllabus)

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী

৫৬ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

(ফোন : ৩৫-৪৫৩৪)

পরীক্ষার জন্য তৈরী হও

আই টি আই

আই টি আই-এ যারা ভর্তি হতে চাও এখনই আবেদন কর। পশ্চিমবঙ্গের ১৮ টি কেন্দ্রে প্রায় ১০০০০ হাজার ছাত্র ছাত্রীর জন্য এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সেশন শুরু হবে আগষ্ট মাসে। কি কি কোর্স এখানে পড়ানো হয় সেকথায় যাওয়ার আগে আনুষাঙ্গিক আরো দু একটা কথা বলে নিই—এখানে শিক্ষার্থীকে কোন টুইশন ফি দিতে হয় না। শুধু তাই নয়, প্রায় অর্ধেক ছাত্র ছাত্রীকে কর্তৃপক্ষ মাসিক 40 টাকা স্টাইপেন্ড দিয়ে সাহায্য করেন।

এবার কোর্সগুলির খবর। ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রেড ও নন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড এই দুভাগে কোর্সগুলিকে ভাগ করা হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রেডের বিষয়গুলি টার্নার, গ্রাইন্ডার, মেকানিক (মোটর), মেশিনিস্ট, ফার্ম মেকানিক, বিল্ডিং কন্সট্রাকশন, কার্পেন্টার, প্লাম্বার, সার্ভেয়ার, প্যাটার্ণ মেকার, ড্রাফটসম্যান (সিভিল ও মেকানিক) এবং ব্ল্যাকস্মিথ। 16 থেকে 25 বছর বয়স আর অন্ততঃ এইট পাশ হলে উপরোক্ত বিষয়ে পড়ার জন্য আবেদন করা যাবে। তবে সার্ভেয়ার প্যাটার্ন মেকার এবং ড্রাফটসম্যান (সিভিল ও মেকানিক) এর ক্ষেত্রে অবশ্যই মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

কাটিং এবং টেলারিং (পুরুষ ও মহিলা), চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী, বই বাঁধাই, কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং, ফুট ওয়্যার, প্রভৃতি নন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড কোর্স। এগুলিও ম্যধ্যমিক কিংবা অন্ততঃ এইট পাশ হলে ভর্তি হওয়া যায়।

আগেই বলেছি, এ রাজ্যে ১৮ টি আই টি আই কেন্দ্র আছে। কোন কেন্দ্রে কি কি কোর্স পড়ানো হয় তা জেনে নিয়েই আবেদন করতে হবে।

সার্ভেয়ার

ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যান্ডেল, পোঃ ব্যান্ডেল জংশন, হুগলী ঠিকানায় জুনিয়র সার্ভেয়ার কোর্স পড়ার জন্য আবেদন করতে পারো এখনই। সেশন শুরু আগষ্ট মাসে। এক বছরের এই সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে হলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে অন্ততঃ শতকরা 50 নম্বর থাকা দরকার।

কম্পাউণ্ডার্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ভেটেনারি কম্পাউন্ডার্স এ্যান্ড ড্রেসার্স কোর্সে ১৬—২২ বয়স আর মধ্যমিক পাশ থাকলেই ভর্তি হওয়া যায়। এক বছরের কোর্স। পড়তে হবে হস্টেলে থেকে। এই কোর্স কমপ্লিট থাকলে সরকারি পশু হাসপাতাল গুলিতে চাকরীর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ঠিকানা : ডিরেক্টর অব ভেটেনারি সার্ভিসেস, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, 1 কে এস রায় রোড, কলি—1

মাল্টি থেরাপিস্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রস্থেটিক এ্যান্ড অর্থটিক ট্রেনিং সেন্টার মাধ্যমিক পাশ ছেলেদের জন্য মাল্টি থেরাপিস্ট রিহ্যাবিলিটেশন কোর্স (৯ মাসের) পড়াচ্ছেন। সেন্টারটি কটকে। এখানেই হস্টেলে থেকে নিজের খরচে পড়াশোনা চালাতে হবে। সাধারণতঃ আগষ্ট সেপ্টেম্বরে ভর্তির খবর বের হয়। ভর্তি হওয়ার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন লক্ষ্য কর। ঠিকানা : ডেপুটি, ডিরেক্টর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রস্থেটিক এ্যান্ড অর্থটিক ট্রেনিং, পোঃ অঃ বাইরোই—754 010, কটক, ওড়িশা।

খেলাধুলো

পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস কোলকাতা পাতিয়ালা এবং ব্যাঙ্গালোরে খেলাধুলোর উপরে দশমাসের একটি ডিপ্লোমা কোর্স পড়াচ্ছেন নিয়মিত। খেলাধুলোয় উৎসাহীদের কাছে এ সংবাদ নিশ্চয়ই আনন্দের। কোলকাতায় পড়ানো হয়—ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল এবং এ্যাথলেটিকস। এছাড়া ভারতবর্ষের অন্য দুই কেন্দ্রে অন্যান্য খেলাধুলোও পড়ানো হয়। সুবিধে মতো যে কোন একটি ঠিকানায় আবেদন করতে পারো।

কোলকাতা : চীফ এক্সিকিউটিব, এন আই এস ইস্ট সেন্টর, সেকশন—3, সল্টলেক, পাতিয়ালা : ডিরেক্টর এন আই এস, মতিবাগ, পাতিয়ালা—147001 এবং ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানা : চীফ এক্সিকিউটিব, এন আই এস, সাউথ সেন্টার, কস্তুরবা রোড, ব্যাঙ্গালোর। মনে রাখতে হবে, পুরুষ বা মহিলা যারা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছো শুধু তারাই এখানে আবেদন করতে পারবে।

খেলাধুলোয় বৃত্তি

পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস খেলাধুলোয় বিশেষ কৃতী ছেলেমেয়েদের মাসিক বৃত্তি দেওয়ার কথা ভেবেছেন। প্রায় 400 ন্যাশনাল লেভেল স্কলারশিপ দেওয়া হবে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের। অবশ্য যারা কোন ন্যাশনাল স্পোর্টস মীটে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই মাসিক 75 টাকা করে পাবে। আবার মাসে 50 টাকা হিসেবে স্টেট লেভেলে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হবে। বৃত্তির সংখ্যা ৪00। নাম ঠিকানা লেখা 23×10 সেমি মাপের একটি খাম সমেত ডিরেক্টর, এন আই এস, মতিবাগ, পাতিয়ালা—147001 ঠিকানায় এখনই আবেদন কর।

হান্নান আহসান

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

এক ঃ চিহ্ন দেখে দেশ চেনা

আমরা সবাই সংখ্যার সাহায্যে গণনার কাজ চালিয়ে থাকি, একথা তো তোমরা সবাই জানো। ছবিতে ছক কাটা ঘরে যে সব সংখ্যা লেখা হয়েছে সেগুলো কিন্তু এক একটা চিহ্ন। এদের প্রত্যেকটা চিহ্নই হলো এক একটা সংখ্যা। দুনিয়ার সকল দেশের লোককেই কোনও কিছু গুণতে গেলে সংখ্যা ব্যবহার করতেই হবে, আর লিখতে গেলে কতকগুলো চিহ্ন চাই। বিভিন্ন ভাষায় এক থেকে নয় লিখবার জন্য বিভিন্ন সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়; তারপর দশ, পনেরো, একশো; হাজার এইসব।

কোন দেশের সংখ্যা পদ্ধতিতে দশকে 'বেস' হিসাবে ধরা হয়। এর অর্থ এই সংখ্যা পদ্ধতিতে সব সংখ্যা হচ্ছে দশের গুণিতক আর কি! বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ধরণের বেস-এর ধারণা করা হয়েছিল। মায়া সভ্যতার কুড়িকে বেস হিসাবে ধরা হয়েছে, ব্যাবিলনীয়রা আবার ষাটকে বেস ধরেছে। আমাদের দশমিক প্রথায় দশকে বেস হিসাবে ধরা হচ্ছে আজকাল।

ছবিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বারোটা সংখ্যা পদ্ধতি লেখা হয়েছে। তোমরা কোন্ দেশের কোন সংখ্যা পদ্ধতি হবে সেটা কি মাথা খাটিয়ে বলতে পারো?

i.	Babylonian	a
ii.	Chinese	b
iii.	East Arabic	c
iv.	Egyptian	d
v.	English	e
vi.	Gothic	f
vii.	Greek	g
viii.	Hebrew	h
ix.	Hieratic	i
x.	Hindu	j
xi.	Mayan	k
xii.	Roman	l

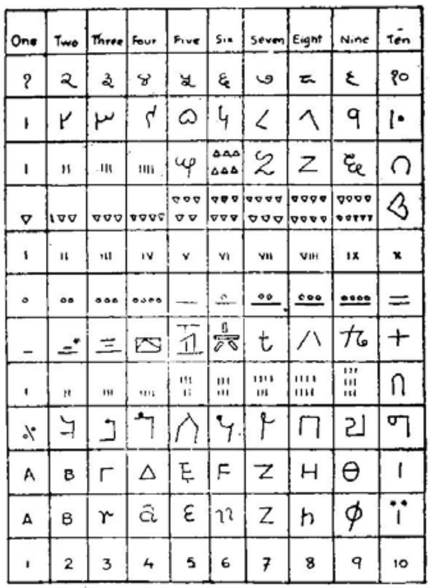

দুই ঃ বর্গক্ষেত্রের ধাঁধা

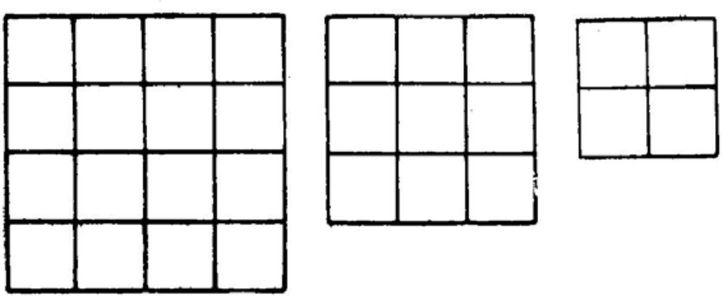

বাঁ দিকের ছবিতে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে সেখানে পাঁচটা বর্গক্ষেত্র রয়েছে, এদের মধ্যে চারটে 1×1 সাইজের এবং বাইরেরটা 2×2 সাইজের।

এবার মাঝের ছবি ও একেবারে ডানদিকের ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাও। এখানে বিভিন্ন সাইজের কটা বর্গক্ষেত্র আছে বলত? কতগুলো বর্গক্ষেত্র আছে যাদের সাইজ 5×5? অঙ্কের কোনও সূত্রের সাহায্যে এই বর্গক্ষেত্রের ধাঁধায় যার সমাধান করতে পারা যায় কি?

(বুদ্ধি নিয়ে খেলার উত্তর 39 পৃষ্ঠায়)

পার্থসারথি চক্রবর্তী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

উড়ন্ত হাসপাতাল

কথাটা আজগুবি বলে মনে হচ্ছে! আসলে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই ঘটিয়েছে আমেরিকা। তারা হাসপাতালকে স্থলে, জলে দেখেই সন্তুষ্ট নন তাই স্থাপন করলেন আকাশেও। ভাবছ সেটা আবার কেমন? তাহলে আসল ব্যাপারটাই বলি। আমেরিকার ডাক্তাররা চাইলেন যে তাদের দেশের সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে দেবেন ও অন্যান্য দেশ থেকে তাদের অজানা তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাই তারা 'উড়ন্ত হাসপাতাল' তৈরী করার জন্য প্রস্তুত হলেন। একটা কথা হাসপাতালটি কিন্তু কেবল চক্ষু অপারেশনের জন্য। বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা দান করেছেন দেশের ধনী লোকেরা। এমনকি যে জেট বিমানে হাসপাতালটি আছে তাও একজনের দান। হাসপাতালের নাম রাখা হয়েছে, 'স্পেস অরবিস'। বিভিন্ন দেশ ঘুরে তারা বহু সহস্র লোকের চক্ষু অপারেশন করেছেন। পরিভ্রমণকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবতরণ করে তাদের অত্যাধুনিক চক্ষু অপারেশনের বহু তথ্য সংগ্রহও করেছেন। যেমন চীন ও পেরু থেকে চোখের ছানি অপারেশনের সহজ পদ্ধতি শিখে এসেছেন। এইভাবে সারা পৃথিবীতে চিকিৎসার অত্যাধুনিক তথ্য সকলকে অল্পসময়ে জানানো, ও চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনায় বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের মতামত গ্রহণ করাই এই উড়ন্ত হাসপাতালের কাজ। 1982তে তৈয়ারী এই হাসপাতাল আজও অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

মানিকচাঁদ মারোঠী

হেঁচকি, শুধু হেঁচকি

● দিনে কটা হেঁচকি একজন সুস্থ লোক সহ্য করতে পারে? এন্ডি ব্রুস নামে 65 বছরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গত 15 মাস ধরে মিনিটে 35টি করে হেঁচকি হচ্ছে! তিনি সব রকম চিকিৎসা করে দেখেছেন, কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেখেছেন, গলায় চামচ ঢুকিয়ে দেখেছেন, মাছ ধরা নৌকায় চড়ে আগুন লাগিয়ে ভয় পেয়ে দেখেছেন —কোন কিছুতেই তার হেঁচকি কমে না। চিকিৎসায় তার 1000 ডলার বা আট, নয় হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে, তবু হেঁচকি থামে নি। এখন বুড়োর ইচ্ছে তিনি একজন ডাইনি বদ্যি দেখাবেন। কেননা, শুধু ঐটেই বাকী আছে।

উড়ন্ত চাকী

সম্প্রতি একটা উড়ন্ত চাকী ভারতের একটা অঞ্চলে বেশ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। গোলাকার একটা বড় উড়ন্ত চাকী তার চারদিকে অগ্নিশিখা নিয়ে হাজারীবাগ থেকে 50 কিলোমিটার দূরে লেপে গ্রামের একটা বড় পুকুরে গিয়ে পড়ে। আর এর ফলেই ঐ বিপর্যয়। পুকুরটা শুকিয়ে গিয়ে সমস্ত মাছ মরে গেছে। তাছাড়া এর প্রভাবে মারা গেছে একটা বড় গরু। উঠে গেছে গ্রামের বেশ কয়েকটা কুঁড়ে ঘরের চালা। এখানেই শেষ নয়। কয়েকটি বড় গাছও উৎপাদিত হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সব লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড ঘটেছে।

একজত প্রত্যক্ষ দর্শী জানিয়েছেন যে, ঐ উড়ন্ত চাকীটি পুকুরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের জল এত গরম হয়ে ওঠে যে, সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মাছগুলো মরে যায়।

বরুণ মজুমদার

বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভিনব প্রয়াস

জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ এই দুই পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ এতদিন তার প্রয়োজন মিটিয়েছে, কিন্তু সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভিনব প্রচেষ্টা চলছে ক্যালিফোর্নিয়ার 'পোলার ওন' নামে এক প্রয়োগশালায়। বিরাট বিরাট আরশির সাহায্যে সূর্যের কিরণ বালিয়াড়ির ওপর প্রতিফলিত করা হবে, তা থেকে উৎপাদিত হবে বিদ্যুৎ। 1988 সালের মধ্যে এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে পঞ্চাশহাজার বাড়ি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

প্রণব সেন

পাখীরাও আত্মহত্যা করে

আসামের হাফলং জেলার জাতিংগা গ্রামে একটি ঘটনা বেশ কয়েকবছর ধরে গ্রামবাসীদের মনে চঞ্চলতার উদ্রেক করেছে। ঘটনাটি যেমন বিস্ময়কর তেমনই আবার মর্মান্তিক। ঘটনাটি ঘটে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ণিমার রাত্রে। ঐ দিন এক বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা জাতের পাখি হাজারে হাজারে আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। অবশ্য এর কারণ নিয়ে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরাও অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এবং এর অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারও একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার বিশিষ্ট পক্ষীবিজ্ঞানী ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত বেশ কয়েকবছর ধরে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ করছেন। তাঁর উপরে ভার পড়েছে কেন এবং কি কারণে পাখিরা এমনিভাবে আত্মহত্যা করে।

চৈতালী ঘোষ

বিজ্ঞানের ভেল্কি

মজার সুতা

অতীন অধিকারী

আজ তোমাদের এমন একটা ম্যাজিক শেখাবো যা দেখিয়ে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অবাক করে দিতে পারবে। এই ম্যাজিকটির জন্য শুধু কিছু নুন; গজ দুয়েক সুতা ও একটি হালকা তারের আংটি হলেই চলবে। প্রথমে সুতাটিকে বেশ কড়া নুন জলে ভিজিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নাও। এইভাবে সুতাটিকে কড়া নুনজলে ভেজানো ও শুকানো ৮/১০ বার করবে।

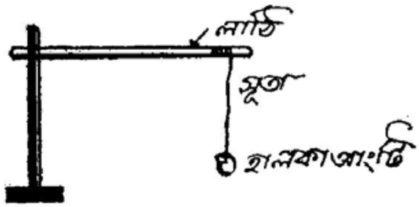

ক

ম্যাজিক যখন দেখাবে তখন সুতাটির একটি প্রান্ত একটি লাঠির সঙ্গে বেঁধে দেবে এবং অপর প্রান্ত তারের হালকা আংটিটির সঙ্গে বেঁধে দেবে। এবার ঐ লাঠিটিকে আরেকটি লাঠি মাটিতে পুতে তার সঙ্গে শক্ত করে এমনভাবে বাঁধবে যাতে ঐ লাঠিটি মোটেই না নড়ে।

এবার তোমার কাজ শেষ। এখন একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে সুতাটিতে আগুন লাগিয়ে দাও। দেখবে জ্বল জ্বল করে সুতাটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু আংটিটি সুতাতে ঝুলে থাকল। বলা বাহুল্য দর্শকেরা জানল না যে সুতাটি নুন জলে ভেজানো ছিল।

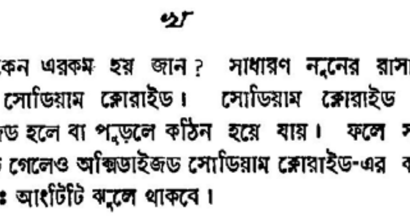

খ

কেন এরকম হয় জান? সাধারণ নুনের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড অক্সিডাইজড হলে বা পুড়লে কঠিন হয়ে যায়। ফলে সুতাটা পুড়ে গেলেও অক্সিডাইজড সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর কাঠিন্য বশতঃ আংটিটি ঝুলে থাকবে।

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক

দিনোজকুমার দে

প্রঃ—1. কোন্ প্রকার কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না ?

উঃ—মনোস্যাকারাইডের ($C_6H_{12}O_6$)-এর পরিপাকের কোন প্রয়োজন হয় না। ইহা সরাসরি শোষিত হয়।

প্রঃ—2. শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য বলা হয় কেন ?

উঃ—কোন মানুষ দীর্ঘদিন প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ না করে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারে। সেইজন্য শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য বলে।

প্রঃ—3. মানুষের শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন কেন ?

উঃ—মানুষের মস্তিষ্কের কোষগুলি প্রোটিন কিম্বা ফ্যাট জাতীয় খাদ্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারে না। শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

প্রঃ—4. সর্বাপেক্ষা সরল প্রোটিনের নাম কি ও তার সংকেত কি ?

উঃ—সর্বাপেক্ষা সরল প্রোটিনের নাম গ্লাইসিন ও তার সংকেত $C_2H_5O_2N$।

প্রঃ—5. উদ্ভিজ প্রোটিন ও প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা সুবিধাজনক ও কেন ?

উঃ—প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করা সুবিধাজনক কারণ উদ্ভিজ প্রোটিন অপেক্ষা প্রাণিজ প্রোটিন সহজ পাচ্য।

প্রঃ—6. এমন একটি মৌলিক পদার্থের নাম বল যেটি প্রাণীদের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু উদ্ভিদের কোন প্রয়োজনে লাগে না ?

উঃ—আয়োডিন।

প্রঃ—7. জীবের দেহ গঠনের জন্য মোট কটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন ?

উঃ—জীবের দেহ গঠনের জন্য মোট তেইশটি (23) অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন।

প্রঃ—8. মানুষ নিজের দেহে কয়টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করতে পারে ?

উঃ—মানুষ নিজের দেহে মাত্র তেরটি (13) টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করতে পারে।

প্রঃ—9. রান্না করলে কোন্ ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় ?

উঃ—রান্না করলে ভিটামিন C নষ্ট হয়ে যায়।

প্রঃ—10. কোন্ ব্যাকটেরিয়া আমাদের দেহে ভিটামিন B_{12} উৎপন্ন করে ?

উঃ—এসেরিকিয়া কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া আমাদের দেহে ভিটামিন B_{12} উৎপন্ন করে।

প্রঃ—11. দুটি কো-এনজাইমের উদাহরণ দাও।

উঃ—দুটি কো-এনজাইমের উদাহরণ ADP ও NADP

প্রঃ 12 একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রত্যহ কত গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করা প্রয়োজন ?

উঃ—একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রত্যহ কমপক্ষে 10—15 গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রঃ—13. তৈল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ—যে সকল স্নেহ পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল তাহাদিগকে তৈল এবং যে সকল স্নেহ পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন তাহাদিগকে চর্বি বলে।

প্রঃ—14. হাইড্রোজিনেসন কি ?

উঃ—তৈলের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করে তৈলকে কঠিন চর্বিতে পরিণত করার পদ্ধতিকে বলে হাইড্রোজিনেসন।

প্রঃ—15. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের রক্তে শর্করার (Blood sugar) পরিমাণ কত ?

উঃ—একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রতি 100ml রক্তে শর্করার পরিমান প্রায় 80—120mg.

প্রঃ—16. গ্লুকোসুরিয়া কি ?

উঃ—রক্তে শর্করার পরিমাণ 170mg-এর বেশী হলে ঐ অতিরিক্ত শর্করা মূত্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। মূত্রের সহিত শর্করা নির্গত হওয়ার পদ্ধতিকে বলে গ্লুকোসুরিয়া।

প্রঃ—17. গ্লুকোনিওজেনেসিস কাকে বলে ?

উঃ—কার্বহাইড্রেটবিহীন পদার্থ হইতে গ্লুকোজ সৃষ্টির পদ্ধতিকে বলে গ্লুকোনিওজেনেসিস।

প্রঃ—18. কোন ব্যক্তি যদি কেবল মাংস আহার করে বাঁচিতে চায় তাহা হলে সেই ব্যক্তিকে প্রত্যহ কত মাংস আহার করতে হবে ?

উঃ—প্রায় তিন (3) কে.জি. মাংস আহার করতে হবে।

প্রঃ—19. অ্যান্টি ভিটামিন কাকে বলে ?

উঃ—যে সকল জৈব বস্তু ভিটামিনের কাজে বাধা সৃষ্টি করে বা ভিটামিনকে বিনষ্ট করে সেই সকল পদার্থকে বলে অ্যান্টি ভিটামিন।

প্রঃ—20. আমাদের অন্ত্র জীবানুমুক্ত হলে কি ক্ষতি হবে ?

উঃ—মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগ ঘটতে পারে। কারণ অন্ত্রে বসবাসকারী জীবানুরা আমাদের শরীরে ভিটামিন B_{12} তৈরী করে যার অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হয়।

স্যার আর্থার কোনান ডোয়েলের ঃঃ
দ্য লস্ট ওয়ার্লড
চিত্রকাহিনী
গৌতম কর্মকার
খেলোয়াড়, শিকারী আর পর্যটক হিসাবে আমার খ্যাতি আপনাদের অজানা নয় আশা করি। তাছাড়া আমাজন নদীর অনেক দূর পর্যন্ত আমি অভিযানে গিয়েছিলাম। কাজেই এই অভিযানে সঙ্গ দেবার যোগ্যতা আমার আছে বলেই মনে করি।
আমি এডওয়ার্ড ডান মেলোন, 'ডেলিগেজেটের' একজন রিপোর্টার। সম্পূর্ণ মুক্ত মন নিয়েই অভিযানে অংশ নিচ্ছি।
ধন্যবাদ বন্ধুগণ! আমি প্রস্তাব করছি– মিঃ সামার্লি, মিঃ রক্সটন এবং মিঃ মেলোন, এঁদের নিয়ে অভিযান কমিটি গঠিত হোক। কমিটির সভাপতি হোন মিঃ সামার্লি।
আপত্তি নেই আমার।
ধন্যবাদ। আসছে সপ্তাহের বুধবার একটি জাহাজ প্যারাবন্দর যাচ্ছে। ঐ জাহাজেই শুরু হোক আপনাদের অভিযান।
চ্যালেঞ্জারের প্রস্তাব সকলেই মেনে নিলেন।
যাত্রার দিন এসে গেল। বসন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।
৩

আশ্চর্য, এখনো পর্যন্ত মিঃ চ্যালেঞ্জার এলেন না! অথচ পথের কোন নির্দেশ পর্যন্ত দেননি!
এমন সময় নাটকীয়ভাবে দেখা দিলেন চ্যালেঞ্জার।
এই নিন সেই নির্দেশ। একটা অনুরোধ, ম্যানাওস শহরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই খাম কেউ খুলবেন না।
কামনা করি – আপনাদের যাত্রা সফল হোক। তবে মনেও ভাববেন না, আপনারা আমার উপকার করছেন। বিজ্ঞানের একটা সত্য প্রমাণে আপনারা ব্রতী হয়েছেন – এই মাত্র। নমস্কার।
অভিযাত্রী দলটিকে নিয়ে বিশাল জাহাজটি তার যাত্রা শুরু করল। শুরু হল রহস্যময় একটি অভিযান।
আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে প্যারাবন্দরে পৌঁছে গেলেন সবাই। এবার স্টীমার নিয়ে ম্যানাওস শহরের দিকে যাত্রা করলেন তিন পর্যটক।
10

GOUTAM KARMAKAR
ম্যানাওস শহরেব্রিটিশ-ব্রাজিলিয়ান ট্রেডিং কোম্পানীর সহায়তায় অভিযানের প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ শুরু হল।
এখানকার প্রকৃতি আশ্চর্য রকমের সুন্দর। মিঃ সামার্লি সারাদিন কেবল পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ান।
অভিযানের জন্যে সংগ্রহ করা হল লোকজন। একজন নিগ্রো-নাম জ্যাম্বো। অন্য দুজন-গোমেজ আর ম্যানুয়েল। ওরাও কৃষ্ণাঙ্গ।
বলিভিয়ার তিনজন ইণ্ডিয়ানকেও নিযুক্ত করা হল-মোজো, জোসি ও ফার্ণাণ্ডো।
নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেল। খামের উপর লেখা ...
ম্যানাওস শহরে ১৫ই জুলাই বৈলা ঠিক বারোটার সময় খুলতে হবে।
এখনও ঠিক সাত মিনিট বাকী।
যতো সব বুজরুকি!
11

ধাপ্পাবাজীর প্রমাণ এবার পেলেন তো ? ভণ্ড, জোচ্চোর কোথাকার!
নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হল খামটা — একদম সাদা। দেখে জ্বলে উঠলেন সামার্লি।
ভিতরে আসতে পারি ?
হঠাৎ ভেসে এল একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর।
এ যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের গলা।
পৌঁছতে সামান্য দেরী হয়ে গেল। আপনাদের সঙ্গে এভাবে ছলনা করার জন্যে দুঃখিত। আমি মাপ চাইছি। আর নিজেই যখন যাচ্ছি তখন পথ দেখাবার অসুবিধা হবে না। এখন থেকে আমিই সব দায়িত্ব নিচ্ছি।
আমিও আপনাদের সাথে অভিযানে আসব, একথা সভায় জানালে প্রবল আপত্তি উঠতো, তাই একটু অন্য পথ ধরতে হল।
আমার দিক থেকে কোন আপত্তি উঠতো না।
একটি বোট ভাড়া নিয়ে এবার আমাজনের পথে যাত্রা শুরু হল।
12

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

জুন '84 সংখ্যার নলেজ ক্যুইজের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হল—

1. অভীককুমার হালদার। 5A, দলু সরকার লেন, কলি-23।
2. অয়স্পরতন দাস। F 1/7, পি. সি. রোড, দুর্গাপুর-5, বর্ধমান।
3. কৌশিক রায়চৌধুরী। 2/4, নারায়ণ রায় রোড, কলি-8।

উপহারস্বরূপ সমরজিৎ করের 'নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী' যথাসময়ে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জুন 84 সংখ্যার নলেজ ক্যুইজের দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ প্রত্যয় ব্যানার্জী, পার্থ ভট্টাচার্য, সেজুতি মিত্রমজুমদার, সুমন্ত ঘোষ, পারমিতা দাস, শুভজিত মিত্র মজুমদার, মিলনকুমার মুখার্জী, মনিষরঞ্জন বিশ্বাস, অর্ণব চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ চক্রবর্তী, কুশকুমার বেহেরা ও অন্যান্য, স্বাতী রায়, প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য, শোভনপ্রতিম খান, সঞ্জয় কুমার গাঙ্গুলী, সুব্রত পাল, প্রণবকুমার সরকার, ও অন্যান্য, অতনু চক্রবর্তী, মধুবন্তী রায়চৌধুরী, শ্যামাশঙ্কর মজুমদার, বিপ্লবকুমার ভট্টাচার্য, শৌভিক রায়, শুভব্রত রায়, কালিশঙ্কর চক্রবর্তী, অর্ণব চৌধুরী, অমিতাভ বসাক, প্রবাল নন্দী, দেবাশীষ রায়, সুশোভন ব্যানার্জী, তাপস রায়, তুষার কান্তি রায়, গৌরব বসু, কবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা মন্ডল, পার্থসারথি চক্রবর্তী, পার্থ জোয়ারদার, শমী গুপ্ত, মিলি পাল, হিমাদ্রিশেখর আদিত্য, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সঞ্চিতা পাল, বিজয়লক্ষ্মী ব্যানার্জী, পূর্বাচল বিশ্বাস, অনির্বাণ সিংহ, অনুপ ঘোষ, অশোক মজুমদার।

24-পরগণা ঃ অভীক চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ ভাদুড়ী, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবালকুমার মুখার্জী, ভাস্কর নন্দী, আশিস চক্রবর্তী, জয়ন্ত বড়ুয়া, দেবেশ দাস, পার্থ চক্রবর্তী, মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অ্যাপোলো মজুমদার, সুদীপ চৌধুরী, সঞ্জিতকুমার দত্ত, মিতালি দাশ, স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য, গৌতম কর্মকার, অভীক সেনগুপ্ত, অরুণা বল, আশিস চক্রবর্তী, সুপ্রিয় বিশ্বাস, অনুকুল চন্দ্র পাল, অরুণা হালদার, সুবীর ব্যানার্জী, স্মৃতিকণা কর, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরজিৎ দত্ত, পিনাকী মুখার্জী, অঞ্জন ব্যানার্জী, কিংশুক মুখার্জী, কাকলী মুখার্জী, শুভব্রত মিত্র, মৌসুমী ভট্টাচার্য, শমিত চক্রবর্তী, সঞ্জয় সেনগুপ্ত, শিল্পী রায়, নিলয় মণ্ডল, তমাল ঘটক, সঞ্জয় কুমার সাহা, বিদ্যুৎকুমার জ্যোতিষ, রমা চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সুদীপ্ত দাসগুপ্ত, বঙ্কিম চক্রবর্তী, রুমা গুহ।

হাওড়া ঃ বিভূতিভূষণ মণ্ডল, সৌমেন বসু, প্রদীপময় ভট্টাচার্য, শ্যামলকুমার দাস, দুলাল গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর ভৌমিক, প্রদীপ চেতলাঙ্গিয়া, দেবরত্না সরকার, মৌ মণ্ডল, অভীক কুমার মণ্ডল, রুচিরা মণ্ডল, হারুকুমার দাস, তাপস ঘড়ুই, তন্ময় চৌধুরী, সুরজিৎ ব্যানার্জী, সুকমল দত্ত, ইন্দ্রজিৎ দত্ত, গৌরীশঙ্কর পারিয়া, শিবশংকর পারিয়া, সুরজিৎ দাস, নন্দিনী বেরা, মঞ্জু বেরা, সুদীপ হাইত, আমিনুর রহমান।

হুগলী : বুবুল দত্ত, অজয় সরকার; সোমনাথ ব্যানার্জী, বাপ্পা কুমার, ময়ূখ দত্ত; দেবাংশু ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিককুমার দে, দূর্বা রায়, সুতপা দাস, প্রদীপ ঘোষ; বিশ্বনাথ কুমার, ভীষ্ম রায়, সুপ্রীতি কুমার, প্রসূন কুমার বসু, পার্থ গোস্বামী, দেবব্রত রায়, অঘন সাহা, দীপঙ্কর সাহা, শুভেন্দু দাস; মৌমিতা চৌধুরী, মৃন্ময় পাত্র, অভিশেক দত্ত মজুমদার, অদ্রি সাহা; জয়দীপ ধর, সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী, অঞ্জন চক্রবর্তী; মানসকুমার দাস; সুকান্ত খাঁন, প্রদীপ্ত চক্রবর্তী; সুকান্ত চৌধুরী, বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়; শর্মিষ্ঠা ঘোষ, কৌশিক কুমার কুণ্ডু।

বর্ধমান : মনোমোহন টুডু, শান্তনু ঘটক; তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণী দাস, অনিমেষ ব্যানার্জী, আশিস রায়; কৃষ্ণগোপাল সেন, সুশান্ত মুখার্জী, ও অন্যান্য, সোনালী দাশগুপ্ত, রেবা গুহ, নবেন্দু গুহ, সুধাংশুকান্তি সিনহা, সুপ্রিয় মুখার্জী, স্বরূপ কুণ্ডু, কল্লোল গাঙ্গুলী, শোভন দত্ত; রাজীব সরকার, শুভময় ঘোষ, কৌশিক আচার্য কৌশিক ব্যানার্জী; সোমা দত্তগুপ্ত, মোহনলাল চক্রবর্তী খুকু, বাবলী ও অন্যান্য, ফওজুল কবীর; জিনিয়া জুয়েল ও অন্যান্য; নিলয়কুমার হাজরা, জয়ন্ত বিশ্বাস; মৌসুমী বিশ্বাস পরিমল রায়; সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, জীতেশ রায়, মানিকচাঁদ মারোঠী, মনোজকুমার মারোঠী; অঞ্জন চক্রবর্তী, পলাশ চট্টোপাধ্যায়, কনকেন্দু সিনহা, রূপম ব্যানার্জী, সুদীপ সেনগুপ্ত, ইনামুর রহমান, তন্ময় ব্যানার্জী, স্বস্তি চ্যাটার্জী, স্নেহাশীষ চন্দ্র, পার্থসারথি ব্যানার্জী; সিদ্ধার্থ শঙ্কর ব্যানার্জী, রুমা ব্যানার্জী, সুশোভন হাটি ও অন্যান্য, অমিত সংহ রায়, সুব্রত দেওঘরিয়া, অনুরাধা সরকার, সোমা বণিক, শুভ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি পানি, সোমা রায়, প্রেমকুমার আগর ওয়াল, তীর্থ গাঙ্গুলী; মলয়কুমার ব্যানার্জী, অশোককুমার মণ্ডল, এ. ব্যানার্জী।

মেদিনীপুর : অমিতাভ বোস, দীপক পাহাড়ী, সুধাংশু মণ্ডল; প্রতাপ মাহাতো; গীতা সরকার, তাপসকুমার ভুঞ্যা, রুমা, শোভন, সোনালী, দেবাশিস পট্টনায়ক, দেবযানী বেরা, চন্দনকুমার মাহাতো; শ্রাবন্তী পাইক, চম্পা মাহাতো, নীলাঞ্জন চক্রবর্তী; রাজর্ষি দাস, সুধীনকুমার জানা, রাতুল পাল, বিপ্লবকুমার চক্র, ঋত্বিক নন্দ, মানস পাড়ুই, দেবাশীষ পাল, প্রদীপ সরখেল, শুভেন্দু ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ, মলয়কুমার প্রধান; সুদীপ মাইতি, রাজু দাস, অতীশ দাস, সোমেনকুমার সাহা, পরিমলকুমার বেরা; রিঙ্কু ও বাবুল দেবনাথ।

নদীয়া : সুপ্রতীক রায়, সন্দীপ বিষয়ী, মানিক ব্যানার্জী, অসীম বর্মন সুদীপ্ত কর, দেবাশিস মজুমদার, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, দেবাশিস বিশ্বাস; পিণ্টু চক্রবর্তী, সুজিত খাঁ, তরুণ খাঁ, প্রবীর চক্রবর্তী, অর্পিতা ভট্টাচার্য্য, সনৎ দাস, কানু পাকড়াশী, কৃষ্ণা বিশ্বাস ও অন্যান্য।

মুর্শিদাবাদ : জয়ন্তকুমার পাল, কস্তুরী পাল, সোমেন মজুমদার, চন্দন চক্রবর্তী, সারোয়ারুণ ইসলাম, জিনাত রেহেনা ইসলাম; চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শিখা দাস, দিলীপ দাস; ডলি দাস, ইউসুফ হাসান।

বীরভূম : সুব্রতকুমার মণ্ডল, শাশ্বতী রায় ও মতিউর রহমান, দেবপ্রিয় চ্যাটার্জী; দীপঙ্কর চ্যাটার্জী, সুভাষ গড়াই, পিঙ্কি ও টিঙ্কি, ঝুমা রায়, আনন্দ রহমান; দীপককুমার পাল।

বাঁকুড়া : দেবাশিস দাস, শুভাশিস দাস, সোমা সিংহ, মানসী কর; অংশুমান কর, তরুণকুমার কোনার; অমিত ব্যানার্জী।

পুরুলিয়া : জানকীপ্রসাদ মাহাতো, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার ঘটক, মিঠু ঘটক, সুব্রত, প্যাপিয়া; সপ্রভাত, পৌষালী সেনগুপ্ত।

পঃ দিনাজপুর : শান্তনু দাস, শান্তা চক্রবর্তী, কেয়া দাস, সুপর্ণা হোড়, চিরমী বাগচী; দোলা মজুমদার, শান্তনু সাহা, পিনাকী পাল, অসীম কুমার চ্যাটার্জী, অশোককুমার দাস, তাপস রায়চৌধুরী, অসিত দাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল।

মালদা : অনির্বাণ বিশ্বাস, অনিন্দ বিশ্বাস, আত্মদীপ তরফদার।

কোচবিহার : অমিত রক্ষিত, কৌশিক নিয়োগী।

জলপাইগুড়ি : শান্তনু ভট্টাচার্য, জয়জিৎ লাহিড়ী; শান্তা মজুমদার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, অপরাজিতা রায় ও অন্যান্য, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়।

দার্জিলিং : অতনু ভট্টাচার্য্য, সুদীপকুমার সেনগুপ্ত।

আসাম-লামডিঙ্ : রজত, রূপক, ও কমলেন্দু নাথ।

বিহার-জামসেদপুর : শিবরঞ্জন পাল, ইন্দ্রনীল চৌধুরী, পিনাকী ব্যানার্জী।

ধানবাদ : অরুণকুমার দে, স্নেহাশীষ, স্বর্ণাশীষ ও শুভাশীষ সরকার।

বিহার-ভজুদি : শিউলি পাত্র ও অন্যান্য।

নিউ দিল্লী : অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

ব্লিচিং পাউডার থেকে বিদ্যুৎ

মতিউর রহমান

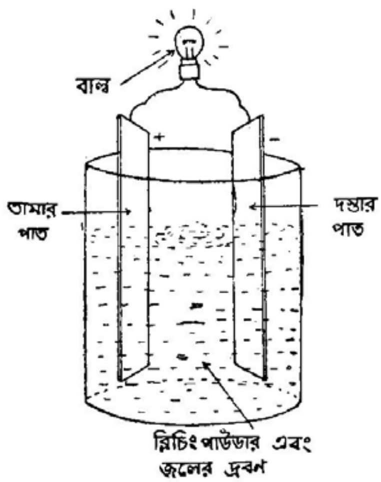

যে মডেল তৈরী করার কথা তোমাদের বলব, সেটা তৈরী করা খুবই সহজ এবং খরচা খুব কম। ব্লিচিং পাউডার আর জলের দ্রবণ থেকে তোমরা বিদ্যুৎ তৈরী করতে পারবে, খুব আশ্চর্য হলে, তাই না ?

কি কি জোগাড় করতে হবে ঃ

(1) একটি বড় বীকার বা বড় বোতল। (2) একটি তামার পাত। (3) একটি দস্তার পাত। (4) ব্লিচিং পাউডার। (5) কিছু তার। আর (6) জল।

এবার কাজ শুরু কর। বীকারে (বা বোতলে) অর্ধেকের একটু বেশী জল নাও। সেই জলে কিছু পরিমাণ শুষ্ক ব্লিচিং পাউডার ভাল করে দ্রবীভূত কর। এবারে একটা তামার পাত আর একটা দস্তার পাত বীকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এখন একটা তার এনে একটা বাল্বের সঙ্গে তামার পাত এবং দস্তার পাতের সংযোগ ঘটাও তাহলে দেখবে বাল্বটি জ্বলছে। ইলেকট্রনিক বাল্ব নিও না কিন্তু। টর্চের বাল্ব নেবে।

কি এবার লোডশেডিং রাত্রিতে এইভাবে আলো জ্বালাবে তো ? দেখবে এক সময়ে আলো নিভে যাবে, তখন ব্লিচিং পাউডার ও জলের দ্রবণটি পাল্টাতে হবে।

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ দিবাকর সেন

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত'। পরবর্তী গ্রন্থ 'প্রবন্ধাবলী'। কেবল মাত্র 'অব্যক্ত' ও প্রবন্ধাবলীর কিশোরপাঠ্য রচনাই নয়,—জগদীশচন্দ্রের আরও অনেক গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী চিঠিপত্র ও বক্তৃতাবলী বর্তমান সঙ্কলনে প্রকাশিত হলো যা ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। দুষ্প্রাপ্য বহু আলোকচিত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থটির দাম ২৫ টাকা।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ভেবে ভেবে বল

শুভাশিস ঘোষ

1. নীচের ছবিগুলি কিসের ?

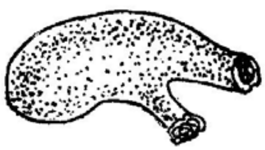

1

2

3

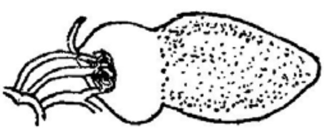

4

2. 'বাঁচার সংগ্রাম'—প্রবক্তা হলেন ঃ

ক. মেণ্ডেলিভ, খ. ল্যামার্ক, গ. ডারউইন।

3. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকে চলন/গমন বলে।

4. নীচে কোন মৌলের আইসোটোপ ?

5. কোনটি বিরল মৃত্তিকা মৌল Lu, Li, Rn, Cl ?

6. Na_2ZnO_2—কিসের সংকেত ?

ক. মিথেন, খ. জিঙ্কেট, গ. সোডিয়াম জিঙ্কেট, ঘ. ইথিলিন।

● ● ● ● ● ● ●

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর ঃ

1. জিয়াডিয়া, অ্যাসিডিয়া, মাইট্রোকনড্রিয়ার আভ্যন্তরীণ গঠন, ডিসসিডিয়া
2. গ. ডারউইন। 3. চলন বলে। 4. লিথিয়াম (Li)
5. Lu 6. সোডিয়াম জিঙ্কেট।

শব্দকূট

কিংশুক সেন

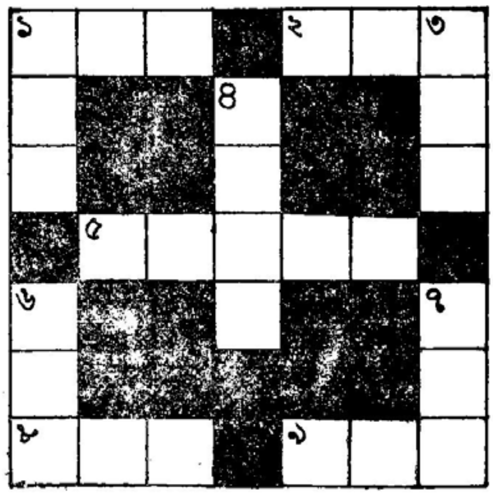

পাশাপাশি ঃ—1. 'পিউরিন' জাতীয় এক প্রকার অ্যালকালয়েড, যা চা ও কফি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। 2. স্তন্যপায়ী মারসুপিয়াল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী, অস্ট্রেলিয়াতে খুব বেশী দেখা যায়। 5. জিঙ্কের একটি হলুদ বর্ণের অশুদ্ধ অক্সাইড যোগ থেকে প্রাপ্ত মৌল। পারমাণবিক গুরুত্ব 112·4. 8. 1975 সালের 17ই জুলাই সংঘটিত যৌথ মহাকাশ অভিযান পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণকারী অন্যতম রাশিয়ান মহাকাশ যান। 9. সবুজ বর্ণ ও ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট একটি গ্যাসীয় মৌল।

উপর নীচ ঃ—1. বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ। 3. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সমীকরণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপনকারী অন্যতম বিজ্ঞানী। 4. অন্যতম দেহ সংরক্ষক খাদ্য। 6. মঙ্গল গ্রহের চাঁদ। 7. উদ্ভিদের একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন উপক্ষার। চর্ম ও কালি শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

● ● ● ● ● ● ●

গত সংখ্যার নলেজ ক্যুইজের সমাধান

1. শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য। 2. পদ্মফুল। 3. এঞ্জেল ফিস। 4. চিত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। 5. গরিলা। 6. শাহনামা। 7. ডায়োপটার। 8. নাইট্রাস অক্সাইড। 9. লিরা। 10. জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া। 11. গার্লিক। 12. 1914 সালে। 13. 90 মিনিট। 14. পাকিস্তান। 15. জওহরলাল নেহরু গোল্ড কাপ।

জানা অজানা

সৌমিত্র মজুমদার

1. আমাদের চোখ নাচে কেন ?

—চোখের বাইরে যে পাতা বা আবরণ আছে তার কতগুলো মাংসপেশী রক্ত চলাচলের সাময়িক গোলমালে কাঁপতে শুরু করে। সেই স্পন্দনকেই আমরা 'চোখনাচা' বলে থাকি।

2. হাত-পায়ে ঝিন্ ঝিন্ ধরে কেন ?

—বেকায়দায় পড়ার ফলে কিম্বা চাপ লেগে হাত-পায়ের কতগুলি স্নায়ুর কাজ সাময়িক লোপ পায়। স্নায়ুগুলো তাদের কাজ করতে না পারার দরুন ছট্‌ফট্ করে বলে ওই রকম ঝিন্ ঝিন্ ধরার ব্যাপারটা ঘটে।

3. মাছিকে মারলে তার ব্যথা লাগে কি ?

—কীটতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, মশা, মাছি ইত্যাদির মগজ যথেষ্ট পরিপুষ্ট নয়। সেইজন্য যন্ত্রণা, মৃত্যু যন্ত্রণা, ব্যথা ও বেদনা অনুভব করার কোন শক্তি এদের নেই। তাই, এরা মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে না।

4. মেঘ গর্জন হয় কেন ?

—মেঘ লঘু। মেঘের সাথে মেঘের সংঘর্ষে কোন শব্দ উৎপন্ন হয় না। যদি ঘর্ষণের ফলে একখণ্ড মেঘ থেকে অপরখণ্ডে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়, তবে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং এতেই আমরা 'মেঘ গর্জন' শুনতে পাই।

5. "বরফ মাছ"—কি ?

—কুমেরু অঞ্চলে "বরফ মাছ" নামে এক রকমের অদ্ভুত মাছ আছে। এদের গণ (Genus) হল—'কিনোকেফানাস্'। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এইসব মাছেরা 0° সেন্টিগ্রেডেরও কম তাপমাত্রায় বাস করে। এই মাছেরা মেরুদণ্ডী হলে কি হবে এদের রক্তে 'হিমোগ্লোবিণ' নামক শ্বাস-কণিকাও থাকে না।

6. কোন্ বিড়ালের লেজ নেই ?

—ম্যানদ্বীপের বিড়ালের লেজ নাই। স্থানীয় লোকেরা বিড়ালটিকে "বাস্‌ল ডিগো" (Bustle Digo) বলে থাকেন।

ভারী জল

অশোক বড়াই

জল বলতে আমরা একরকম জলের কথাই জানি। সাধারণ হাইড্রোজেনের অক্সাইড জল নামে পরিচিত। যার সংকেত H_2O। কিন্তু ভারী—জল সেটা কি জিনিস ?

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন হাইড্রোজেনের তিন ধরণের আইসোটোপ আছে—সাধারণ হাইড্রোজেন ডয়ট্রিয়াম এবং টিট্রিয়াম। এই ডয়ট্রিয়ামের অক্সাইডকে (D_2O) ভারী জল বলে। এটা সাধারণ জল, কিছুটা ভারী।

যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট কিন্তু পারমাণবিক ভরসংখ্যা বা নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন তাকে আইসোটোপ বলে। সাধারণ হাইড্রোজেনের প্রতিটি পরমাণুতে আছে 2টি প্রোটন ও 2টি ইলেকট্রন। ডয়ট্রিয়াম পরমাণুতে আছে 2টি প্রোটন, 2টি নিউট্রন; টিট্রিয়াম পরমাণুতে আছে 1টি প্রোটন 2টি নিউট্রন।

তিন ধরণের হাইড্রোজেন প্রতিটি অক্সিজেনের সঙ্গে সমবন্ধনক্ষম। অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ O^{16}, O^{17} ও O^{18} আছে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ যুক্ত হয়ে জল গঠন করে। আবার জলের অণুতে H_2-এর দুটি পরমাণু থাকার ফলে মিশ্র H_2-এর জলের অস্তিত্ব সম্ভব। যেমন H_2-এর সঙ্গে ডয়ট্রিয়ামের, টিট্রিয়ামের আবার ডয়ট্রিয়ামের সঙ্গে টিট্রিয়ামের মিলনেও জল তৈরী হয়। 18 রকম জলের সঙ্কেত ঃ

H_2O^{16}, H_2O^{17}, H_2O^{18}, D_2O^{16}, D_2O^{17} D_2O^{18}, T_2O^{16}, T_2O^{17}, T_2O^{18}, HDO^{16}, HDO^{17}, HDO^{18}, HTO^{16}, HTO^{17}, HTO^{18}, DTO^{16}, DTO^{17}, DTO^{18}।

সাধারণ ও ভারী জলের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ভৌত ধর্ম	H_2O	D_2O
গলনাঙ্ক	0°C	3·82°C
স্ফুটনাঙ্ক	100°C	101·42°C
সর্বোচ্চ ঘনত্বের তাপমাত্রা	4°C	11°C

ভারী জল জলের মতই দেখতে তবে এটি সাধারণ জলের তুলনায় ভারী এবং একটু আঠালো ও চটচটে। এটি সামান্য বিষাক্ত। জ্যান্ত ব্যাঙাচি এর সংস্পর্শে এলে মারা যায়।

ব্যবহার ঃ (i) ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়ট্রিয়াম প্রস্তুতিতে; (ii) রাসায়নিক পদ্ধতি অনুধাবনে; (iii) নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টারে মডারেটার এবং (iv) পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

নলেজ ক্যুইজ

1. ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ পৃথক হয়েছিল কত সালে ?
2. ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ছিল ?
3. নীচের ছবিটি কিসের ?

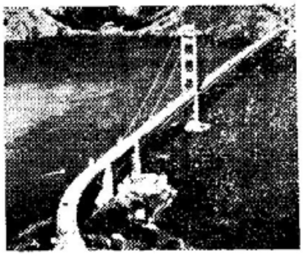

4. ভাকরা বাঁধের উচ্চতা কত মিটার ?
5. 'ইন্ডিয়া হাউস' কোথায় অবস্থিত ?
6. বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটির নাম কি ?
7. ব্যাডমিন্টন নেট-এর কেন্দ্রস্থলের উচ্চতা কত ফিট ?
8. রনজি ট্রফির খেলা শুরু হয় কত সাল থেকে ?
9. ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব কোনটি ?
10. নীচে কোন পাখির ছবি ?

11. চার বেদের প্রাচীনতম কোনটি ?
12. বর্ণের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি ?
13. গোলাপ ফুল কোন্ দেশের জাতীয় প্রতীক ?
14. ইউরেনাস কত বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ?
15. পাশে কার ছবি ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

[উত্তর জুলাই মাসের 15 তারিখের মধ্যে দপ্তরে পৌঁছানো চাই। দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।]

সঙ্কলক ঃ অমরনাথ রায়

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

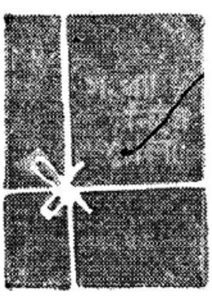

এবার থেকে 'নলেজ ক্যুইজ' বিভাগের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের একটি করে গ্রন্থ উপহার দেওয়া হবে। গ্রন্থকার স্বয়ং সেই উপহারে শুভেচ্ছাসহ অটোগ্রাফ করে দেবেন। চলতি মাসের 15 তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের দপ্তরে পৌছানো চাই। উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম তিনজনকে উপহার দেওয়া হবে। এ মাসের উপহার অমরনাথ রায়ের 'সংখ্যা নিয়ে খেলা'।

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর

প্রশ্ন ও উত্তর

হাতে মুখে জল দেওয়ার পর একটু বেড়াবার জন্য তোমরা অবশ্যই ফাঁকা মাঠের দিকে অথবা পার্কের দিকে এগিয়ে যাও। মাটিতে পা দিলে মনে আসা স্বাভাবিক মাটি কি? কি আছে মাটিতে?

মাটি মিশ্র পদার্থ। লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ফসফেট বা সিলিকেট এবং বালির মিশ্রণ। তবে এগুলো মেশালে ঠিক ঠিক মাটি পাওয়া যাবে না। মাটিতে থাকে আরও হরেক রকমের জৈব পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ঐ জৈব পদার্থ গুলিই মাটির আসল উপাদান। এবং জৈব পদার্থগুলি থাকার ফলেই মাটি জল ধরে রাখতে পারে ও উদ্ভিদদের খাদ্য যোগায়।

খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়ালে আগে পূবের আকাশের দিকে তোমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। পূবের আকাশটা তখন সিঁদুরের মত টকটকে লাল আর রাঙা মেঘের রথে সূর্য্যি ঠাকুর উঁকি দিচ্ছেন। মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসে সূর্য কি?

প্রশ্ন : সারা আকাশটা নীল অথচ পূবের আকাশটা নীল নয় কেন? কেন সন্ধ্যার আকাশটাও লাল হয়? আর সূর্যও তখন কেন লাল? (অমর্ত্য ব্যানার্জি—দুর্গাপুর)

উত্তর : সূর্য প্রকাণ্ড একটি জড় পিণ্ড। পৃথিবী থেকে ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এক বিশাল তেজোময় গ্যাসীয় গোলক। ওর ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। আয়তনে পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। সূর্য দেহের উপাদানগুলির মধ্যে শতকরা 81·7 ভাগ হাইড্রোজেন এবং 18·17 ভাগ হিলিয়াম। অবশিষ্ট মাত্র ·07% কারবন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, নিকেল, তামা, লোহা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের গ্যাস। সূর্য কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় দু কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং পৃষ্ঠ-দেশে তাপমাত্রা প্রায় দু হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। উক্ত প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সেখানকার সমস্ত পদার্থই পরমাণুর আকারে বিদ্যমান। এবং সে পরমাণুগুলোও নিজেদের গঠন ঠিক রাখতে পারছে না। নানা ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো শেষ পর্যন্ত হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে এবং উক্ত কারণেই উৎপন্ন হচ্ছে এমন প্রচণ্ড তেজ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সূর্য কেন্দ্রে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 56 কোটি টন হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ভাবে চলছে প্রায় 500 কোটি বছর ধরে এবং এখনও সূর্য দেহে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে তাতে আরও চলবে 5000 কোটি বছরের অধিককাল। অবশেষে তার হাই-ড্রোজেনের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেলে চিরতরে নিভে যাবে।

প্রভাত সূর্যের অথবা অস্ত সূর্যের লাল রঙের মূলে আছে সূর্য রশ্মির রঙের খেলা। সূর্যের আলোটাকে আমাদের সাদা বলে মনে হলেও সে সাত রঙের সমষ্টি। বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। যে বস্তু সূর্য রশ্মির যে রঙটাকে প্রতিফলিত করতে পারে আমরা সেই বস্তুকে সেই রঙের দেখে থাকি। পার্থিব বস্তুগুলির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, তাদের কেউ কেউ সূর্যরশ্মির সাত রঙের সবগুলোকে শোষণ করে নিতে পারে, কেউ বা সাত সাতটি রঙকে প্রতিফলিত করে দেয়। আবার কেউ কেউ এক বা একাধিক রঙকে প্রতিফলিত করে এবং বাকি রঙগুলোকে শোষণ করে নেয়। যে বস্তু সব রঙকে শোষণ করে নিতে পারে তাকে কালো দেখায় এবং যে বস্তুকে যে রঙের দেখি সেই বস্তুটি সাত রঙের মধ্যে কেবলমাত্র সেই রঙটিকে প্রতি-ফলিত করে দেয় এবং বাদ বাকিকে শোষণ করে নেয়।

আকাশকে নীল দেখানোর কারণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বস্তুকণা সূর্য রশ্মির সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেগুনী ও নীল আলোককে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। আমাদের চোখ আবার বেগুনী অপেক্ষা নীলের প্রতি অধিক সংবেদন-শীল। তাই নীল রঙটাই ধরা পড়ে।

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্য থাকে দিগন্তের কাছাকাছি। সূর্য রশ্মি তির্যকভাবে আসে বলে সুদীর্ঘ ও ঘন বায়ুস্তরগুলি অতিক্রম করে আসতে হয়। ফলে বেগুনী থেকে পর পর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলি শোষিত হতে হতে সবচেয়ে বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ঐ লালটাই অবশিষ্ট থাকে এবং বিক্ষিপ্ত হয়। তাই ঊষা ও গোধূলিতে পূব ও পশ্চিম দিগন্তকে লাল দেখায়।

ঐ সময় একটা গাঢ় সবুজ কাচের ভেতর দিয়ে যদি সূর্যকে দেখ, তাহলে রঙের চাতুরালি ধরতে পারবে। যেহেতু সবুজ কাচ একমাত্র সবুজ রঙ ছাড়া সব রঙকে শোষণ করে নেয়। তাই এক্ষেত্রে লাল রঙটিকেও শোষণ করে নেবে এবং সূর্যকে দেখাবে কালো।

অন্যান্য প্রশ্ন :

প্রঃ ভয় পেলে অথবা ঠাণ্ডায় দেহের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠে কেন?—দীনবন্ধু মিত্র, আমঝোর, বাঁকুড়া।

উঃ ভয় পেলে বা ঠাণ্ডা লাগলে স্নায়ুকলা উত্তেজিত হয়।

প্রঃ ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হয় কেন?—স্মিত সিনহা, উত্তর-পাড়া, হুগলী এবং শেখ মহম্মদ ফারুক, বুড়দা, পুরুলিয়া।

উঃ ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হয় না। তবে ঠাণ্ডায় শরীর দুর্বল হয় এবং এক ধরণের ভাইরাস দেহে সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ পায়।

সুধাংশু পাত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ঃ পেনিসিলিন

চন্দ্রমৌলি মুখোপাধ্যায় (ষষ্ঠ শ্রেণী)

পেনিসিলিন—ছোট্ট একটি নাম, কিন্তু এই নামটি আজ বিশ্বের কারুর কাছেই অজানা নয়। এই জীবাণুনাশক বা অ্যান্টিবায়োটিক-টিকে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ মানুষের কাছে প্রথম পেঁাছেছেন যিনি, তাঁরই নাম সার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।

1881 সালের 6ই আগস্ট তিনি ডার্ভেলের অন্তর্গত 'লক্‌ফিল্ড' নামক স্থানে এক চাষীর ঘরে জন্ম নেন। তিনি জাতিতে ছিলেন আয়ারসায়ার স্কচ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ হলে তিনি লণ্ডনের পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি সেখানে একটি অফিস বয়ের কাজও করতেন।

আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি হাইস্কুলে পড়া শেষ করে কলেজে পড়তে পারলেন না; মাত্র ষোল বছর বয়সে ফ্লেমিং জাহাজ কোম্পানীর কেরাণীর চাকুরি নিলেন।

1901 সালে ফ্লেমিং কিছু সম্পত্তির মালিকানা পান এবং সেই সম্পত্তির আয় তাঁকে কলেজে পড়তে সুযোগ করে দেয়। তিনি উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন।

1905 সালে ফ্লেমিং সসম্মানে ডাক্তারী পাশ করেন। টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কর্তা অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তিনি সেন্ট মেরীস্‌ হাসপাতালে জীবাণু গবেষণায় মন দেন। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই জেনেছিলেন যে, রক্তের শ্বেতকণিকা বা ফিউকোসাইট্‌স্‌ হচ্ছে জীবাণু প্রতিষেধক উপাদান। রাইট ও ফ্লেমিং কিউকোসাইট্‌সদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন। তাঁরা ধারণা করলেন যে, নিউকোসাইট্‌সদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে এরা আরো ভালভাবে রোগজীবাণুর সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করবে।

আট বছর ধরে গবেষণা করেও তাঁরা কোন ফল পেলেন না। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা দুজনে যোগ দিলেন সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে এবং তারই সঙ্গে চলতে লাগল তাঁদের জীবাণুগবেষণা।

1922 খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং একটি নূতন জীবাণুনাশক আবিষ্কার করলেন। নাম দিলেন লাইসোজাইম।

1928 সালে ফ্লেমিং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। সেইসঙ্গে চলতে লাগল তাঁর জীবাণু গবেষণা।

একদিন ফ্লেমিং তাঁর গবেষণাগারে পুঁজ উৎপাদনকারী স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটিরিয়া কালচার করে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করবার সময় একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন ঐ কালচার পাত্রগুলির কোন একটিতে সবুজ রঙের ছত্রাক জন্মেছে। তিনি ভাবলেন হয়ত বা ঐ ছত্রাকের বীজ বাতাসে ভেসে এসে কালচার পেটের ওপর পড়েছে। ফ্লেমিং এর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল প্রবল। তিনি লক্ষ্য করলেন ঐ ছত্রাকের চারপাশে স্ট্যাফাইলো কক্কাস ব্যাকটিরিয়াগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফ্লেমিং বহুবার একই পরীক্ষা করলেন। ফল একই পাওয়ায় তিনি ভাবলেন ব্যাকটিরিয়াগুলো কিভাবে অদৃশ্য হল? অনেক পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ ছত্রাক হচ্ছে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম শ্রেণীর। এরই দেহনিঃসৃত পদার্থ স্ট্যাফাইলোকক্কাস শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করেছে।

ফ্লেমিং এতদিন ধরে যা' খুঁজছিলেন হঠাৎ আকস্মিক ভাবেই তা' পেয়ে গেলেন। তিনি পেনিসিলিয়াম নোটেটাম শ্রেণীর ছত্রাকের দেহনিঃসৃত জীবাণুনাশক পদার্থটির নাম দিলেন পেনিসিলিন।

পাদটীকা ঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

জন্ম ঃ 1881 খ্রীষ্টাব্দ মৃত্যু ঃ 1955 খ্রীষ্টাব্দ

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

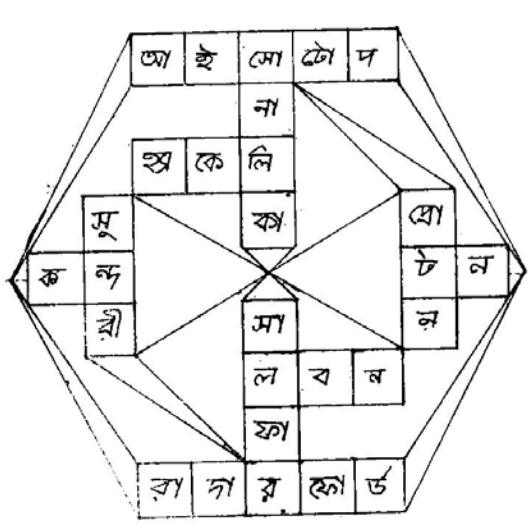

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে।
সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান.
কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও ত নানা রকমের।
কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে।
আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে।
লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা
করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়।
কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান—
যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই
সমস্ত চিঠি খুলে, পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়।
তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে
আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি
পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন:
এক : কি ধরনের লেখা : ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
দুই : সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা : বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর,
নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।
তিন : সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং কোন নির্দিষ্ট
বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।
চার : আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই
বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।
আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা
আমাদের সহযোগিতা করবেন।

সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 4th Yr Vol III · July 1984 Regd No WBEC/255

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·00

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·00 **সমুদ্রের সম্পদ** ৮·00

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·00

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·00

অমরনাথ রায়
সায়েন্স কুইজ ১০·00

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনাসমগ্র ২৫·00

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·00 মেঘনাদ ১০·00

অদ্রীশ বর্দ্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড · কলকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকতা–৯ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম তিন টাকা। প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ. ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২